রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন —

ابغض اله عبد فى الأرض الهواء

অর্থাৎ, সর্বনিকৃষ্ট মাবুদ, যার পূজা করা হয় পৃথিবীতে, সে হচ্ছে খেয়ালখুশী।

অন্য এক হাদীসে আছে—

من قال لااله الا الله خالصا مخلصا دخل الجنة -

অর্থাৎ, যে খাঁটি মনে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এখানে খাঁটি অর্থ অন্তরকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করা, যাতে অপরের অংশীদারিত্ব না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাই অন্তরের মাবুদ, মাহবুব ও মকসুদ হওয়া। যার এই অবস্থা, দুনিয়া তার জন্যে জেলখানা। কারণ, মাহবুবের সাথে সাক্ষাতে দুনিয়া একটি বাধা। মৃত্যু তার জন্যে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং মাহবুবের কাছে যাওয়া। যার মাহবুব এক সত্তা এবং সে জেলখানায় থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে, সে যদি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাহবুবের সাথে মিলিত হয় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত অনাবিল সুখে কাল কাটায়, তবে সে কতই না সৌভাগ্যশালী।

মহব্বত শক্তিশালী হওয়ার আরেক উপায় হচ্ছে খোদায়ী মারেফত শক্তিশালী হওয়া ও অন্তরে তা বিস্তৃত হওয়া। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে অন্তর পাক হওয়ার পর তা অর্জিত হয়। যেমন, শস্যক্ষেত্রকে সকল আগাছা থেকে সাফ করার পর তাতে বীজ বপন করা হয়। অন্তরকে এভাবে পাক করার পর তাতে মহব্বত ও মারেফতের বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়। এ বৃক্ষের নাম কালেমায়ে তাইয়েবা, যার দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاۤءِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ কালেমায়ে তাইয়েবার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যা পবিত্র

বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে বিস্তৃত।

নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ -

অর্থাৎ, তারই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কালাম ও সৎকর্ম।

এখানে পবিত্র কালামের অর্থ মারেফাত, আর সৎকর্ম এই মারেফাতের বাহক ও খাদেমের মত।

অন্তরকে পবিত্র করে তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখাই যাবতীয় সৎকর্মের উদ্দেশ্য। এভাবে মারেফত অর্জিত হলে তার পেছনে মহব্বত অবশ্যই থাকবে। মহব্বত থাকলে আনন্দও থাকবে।

মহব্বত ও মারেফতে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ঃ সকল ঈমানদার ঈমানে অভিন্ন হলেও মহব্বতে বিভিন্ন। কেননা, দুনিয়াতে মহব্বত ও মারেফত বিভিন্ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ও গুণাবলীর মধ্য থেকে যা শুনে, তাই শিখে মুখস্থ করে নেয়। এর বেশী তারা কিছু জানে না। কেউ কেউ এসব নাম ও গুণের অর্থ এমন কল্পনা করে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। বলা বাহুল্য, এরা পথভ্রষ্ট। আবার কেউ কেউ বাস্তব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় না এবং এসবের কোন অসার অর্থ কল্পনা করে না; বরং সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে। সত্যি বলতে কি, এরাই "আসহাবে ইয়ামীন"! আর যারা প্রত্যেক নাম ও গুণের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ অবগতি লাভ করে, তারা নৈকট্যশীল। আল্লাহ তা'আলা এই তিন প্রকার মানুষের কথা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ -

অর্থাৎ, যদি তারা হয় নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের জন্যে রয়েছে সুখ, রূযী ও নেয়ামতের বাগান। আর যদি তারা হয় আসহাবে ইয়ামীনদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি সালাম। আর যদি তারা হয় পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের আপ্যায়ন করা হবে উত্তপ্ত পানির দ্বারা এবং প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামে।

এক্ষণে আমরা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মহব্বতের বিভিন্নতা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাব। উদাহরণতঃ শাফেঈ মতাবলম্বীরা হযরত ইমাম শাফেঈকে মহব্বত করে। এ মহব্বতে ফেকাহবিদ, আলেম ও জনসাধারণ সকলেই অংশীদার। কারণ, তাঁর জ্ঞান-গরিমা, ধর্মপরায়ণতা, সচ্চরিত্রতা ও প্রশংসনীয় স্বভাব সম্পর্কে সবাই অবগত। কিন্তু সকলের অবগতি সমান নয়। জনসাধারণ তাঁর গুণ-গরিমা সংক্ষেপে এবং ফেকাহবিদগণ বিস্তারিতভাবে জানে। এ কারণে ফেকাহবিদদের মহব্বতও জনসাধারণের তুলনায় অনেক বেশী হবে। এমনিভাবে গোটা এ বিশ্ব আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও কারিগরীর জ্বলন্ত নমুনা। সাধারণ মানুষ এ বিষয়টি কেবল বিশ্বাস করে এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়াকিফহাল। এমনকি, তারা সামান্য একটি মাছির ভেতরে এমন সব আশ্চর্য নিদর্শন দেখে, যা শুনে জ্ঞান-বুদ্ধি হতবাক হয়ে যায়। একারণেই তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও পূর্ণতার গুণাবলী অধিক পরিমাণে জাগরূক থাকে। ফলে, তাদের মহব্বতও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মহব্বতের যে পাঁচটি কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেগুলোর পার্থক্যের কারণে মহব্বতে পার্থক্য হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কেউ আল্লাহ তা'আলাকে এ কারণে মহব্বত করে যে, তিনি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদাতা, তবে তার এই মহব্বত হবে দুর্বল। কেননা, অনুগ্রহের পরিবর্তনে এ মহব্বত পরিবর্তন অনিবার্য। ফলে, বিপদাপদে পতিত হওয়ার সময় এ মহব্বত তেমন থাকে না, যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কারণে মহব্বত রাখে যে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা মহব্বতেরই যোগ্য, সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সকলই তাঁর অর্জিত রয়েছে, তবে তার মহব্বত অনুগ্রহের পরিবর্তনের কারণে কখনও পরিবর্তিত হবে না; বরং সদাসর্বদা একই রূপ থাকবে।

মোটকথা, এসব কারণে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে মানুষের অবস্থা

বিভিন্ন হয় এবং এই বিভিন্নতার ভিত্তিতে পারলৌকিক সৌভাগ্যে পার্থক্য হয়।

আল্লাহর মারেফতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি ঃ পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, সেগুলোর মধ্যে অধিকতর দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তাই যাবতীয় মারেফতের মধ্যে আল্লাহর মারেফতই সর্বপ্রথম বোধগম্য হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো প্রতীয়মান হয়। এর কারণ অবশ্যই জানা দরকার। আমরা আল্লাহ পাককে অস্তিত্ব জগতের সর্বাধিক দৃশ্যমান ও প্রকৃষ্টতর বলেছি। এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে আমরা একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করছি।

যদি আমরা কোন মানুষকে লিখতে, সেলাই করতে অথবা অন্য কোন কাজ করতে দেখি, তবে তার জীবিত হওয়া আমাদের কাছে সর্বাধিক স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ, তার জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা আমাদের মতে তার অন্যান্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর তুলনায় অধিক স্পষ্ট হবে। কেননা, তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যেমন, ক্রোধ, স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি তো আমরা জানিই না। আর বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে কতক আমরা জানি না আর কতক আমাদের জানা হয়ে যায়। যেমন, জীবন, জ্ঞান, কর্মক্ষমতা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অতঃপর আমরা যদি বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী আমাদের জানা হয়ে যায়। পাথর, ঢিলা, তরুলতা, বৃক্ষ, জীবজন্তু, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, সৌরজগত, জল, স্থল ইত্যাদি সকল বস্তু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, কুদরত, জ্ঞান ইত্যাদি গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলো সব এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ যে, একজন স্রষ্টা, পরিচালক ও সবকিছুকে গতিশীলকারী অবশ্যই বিদ্যমান। এ ধরনের সৃষ্টবস্তুর কোন শেষ নেই। তাই আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রমাণসমূহের শেষ নেই। যদি লেখকের জীবন, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা কেবল একটি প্রমাণ অর্থাৎ, তার হাতের নড়াচড়া দেখে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয়ে যায়, তবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও জীব-কিরূপে স্পষ্ট হবে না। তাঁর অস্তিত্ব বুঝাবে না— এমন কোন বস্তুর থাকা সম্ভব নয়। আমাদের ভেতরেও এমন কোন বস্তু নেই এবং বাইরেও নেই। কেননা, বিশ্বের প্রতিটি কণা তার অবস্থার ভাষায় ডেকে বলছে— আমি আপনা-আপনি বিদ্যমান ও গতিশীল নই। আমার আবিষ্কর্তা ও গতিশীলকারী অন্য কেউ। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, অস্থির গ্রন্থি, রক্ত-মাংস ইত্যাদি সবকিছুই একজন স্রষ্টার সাক্ষ্য দেয় বিধায় তিনি এতই

স্পষ্ট হয়ে গেছেন যে, তাঁকে উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা, দু'কারণে কোন বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম। এক, সেই বস্তুর সত্তাগতভাবে অপ্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম হওয়া। দুই, বস্তুর সীমাতিরিক্ত দৃশ্যমান ও প্রকট হওয়া। যেমন, বাদুড় রাতের অন্ধকারে দেখে এবং দিনের আলোতে দেখে না। এর কারণ এটা নয় যে, দিন রাতের তুলনায় অস্পষ্ট; বরং দিন এত বেশী স্পষ্ট যে, বাদুড়ের দুর্বল দৃষ্টি তাতে ধাঁধিয়ে যায়। সূর্যকিরণের তীব্রতা তার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। যখন এর সাথে কিছু অন্ধকার মিশ্রিত হয় এবং প্রকাশ দুর্বল হয়, তখন বাদুড় দেখতে শুরু করে। অনুরূপভাবে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল, আর আল্লাহ্ তা'আলার বিকাশে রয়েছে অসাধারণ চমক ও চূড়ান্ত দীপ্তি। এমনকি তাঁর বিকাশ দ্বারা প্রতিটি কণা দেদীপ্যমান। ফলে, এই অসাধারণ বিকাশই তাঁর গোপন ও অস্পষ্ট থাকার কারণ হয়ে গেছে।

তীব্র প্রকাশের কারণে গোপন থাকার তত্ত্ব শুনে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, বস্তুর বিকাশ ঘটে তার বিপরীত বস্তুর দ্বারা। যেমন, অন্ধকার আছে বলেই আমরা আলো উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তাঁর কোন বিপরীত নেই। এ কারণেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তিনি চূড়ান্ত প্রকট হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থেকে যান। কিন্তু যার অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং শক্তিপ্রবল, সে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন কিছু দেখে না। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই বিদ্যমান নেই। অন্যের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম তাঁর কুদরতের ফল এবং তাঁরই অনুগামী।

শওক তথা আগ্রহের স্বরূপ ঃ যারা মহব্বতের বাস্তবতা অস্বীকার করে, তারা আগ্রহের স্বরূপকে অবশ্যই স্বীকার করে না। কেননা, আগ্রহ মাহবুবের প্রতিই হয়ে থাকে। আমরা এখনি প্রমাণ করব, যে আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহর প্রতি তার আগ্রহ অবশ্যই থাকে এবং সে আগ্রহে বাধ্য।

মহব্বত প্রমাণ করার জন্যে আমরা ইতিপূর্বে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি, বলা বাহুল্য, আগ্রহ প্রমাণ করার জন্যে সেগুলোই যথেষ্ট। অর্থাৎ, মাহবুব যখন দৃষ্টির অন্তরালে থাকে, তখন তার প্রতি আগ্রহ হওয়া অনিবার্য। এর ব্যাখ্যা এই যে, যে বস্তু একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্য

দিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই আগ্রহ হওয়া সম্ভব। যে বস্তু কখনও উপলব্ধিতেই আসেনি, তার প্রতি আগ্রহ হওয়া অসম্ভব। এমনিভাবে যে বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপলব্ধ হয়ে যায়, তার প্রতিও আগ্রহ থাকে না। চূড়ান্ত উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কখনও দেখেনি এবং কখনও তার প্রশংসা শুনেনি। এমতাবস্থায় এই অদেখা ও অজানা ব্যক্তির প্রতি তার আগ্রহান্বিত হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। আর যে ব্যক্তি তার মাহবুবকে সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করে, সে-ও মাহবুবের প্রতি আগ্রহান্বিত হবে না। বরং যে মাহবুব একদিক দিয়ে উপলব্ধ এবং অন্যদিক দিয়ে উপলব্ধ নয়, তার প্রতিই আগ্রহ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির মাহবুব তার কাছেই নেই; কিন্তু তার কল্পনা তার অন্তরে বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই কল্পনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে সে মাহবুবকে দেখতে আগ্রহান্বিত হবে। কেননা, আগ্রহের অর্থ হচ্ছে অন্তরস্থিত কল্পনাকে পূর্ণতা দানের প্রয়াস পাওয়া। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবকে অন্ধকারে দেখে, ফলে তার মুখমণ্ডল উত্তমরূপে দৃষ্টিতে পড়ে না, সে-ও এই অপূর্ণ দীদারকে পূর্ণ করতে আগ্রহী হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মাহবুবের মুখমণ্ডল দেখে, কিন্তু তার কেশ ও অন্যান্য সৌন্দর্য দেখে না, সে-ও এগুলো দেখার জন্যে আগ্রহী হয়।

আগ্রহের উপরোক্ত ধরনগুলো আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বরং প্রত্যেক মহব্বতকারী সাধকের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলার যে সব বিষয় আল্লাহওয়ালাদের সামনে প্রকটিত হয়েছে, সেগুলো যেন হালকা যবনিকার অন্তরাল থেকে দেখার অনুরূপ এবং তাতে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্পষ্টতা নেই। পূর্ণ স্পষ্টতা প্রত্যক্ষকরণ ও জ্যোতির দীপ্তিকে বলা হয়, যা দুনিয়াতে অসম্ভব। কিন্তু এটাই আল্লাহওয়ালাদের চূড়ান্ত প্রিয় লক্ষ্য। তাই আগ্রহ সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ, মহব্বতকারীর সামনে আল্লাহ তা'আলার সামান্য প্রকাশ হওয়ার পর সে পূর্ণ প্রকাশের জন্যে নিঃসন্দেহে আগ্রহী হবে।

অসংখ্য হাদীস ও মনীষীগণের উক্তিতেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে এ দোয়া বর্ণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার আদেশের পর সম্মতি, মৃত্যুর পর সুখী জীবন, তোমার প্রিয় মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং তোমার সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হযরত কা'ব আহবারকে বললেন ঃ আমাকে তাওরাতের কোন একটি আয়াত শুনাও। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— সজ্জনগণ আমার সাক্ষাতের প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়, আর আমি তাদের সাক্ষাতের প্রতি অধিক আগ্রহী। তিনি আরও বললেন ঃ তাওরাতে এই আয়াতের কাছাকাছি আরও উল্লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে। আর যে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে না। হযরত আবুদ্দারদা বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে বললেন ঃ হে দাউদ, পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে শুনিয়ে দাও, যে আমাকে মহব্বত করবে, আমি তার হাবীব। যে আমার কাছে বসবে, আমি তার সহচর। যে আমার যিকর দ্বারা প্রীতি অর্জন করবে, আমি তার প্রিয়জন। যে আমার সাথে থাকবে, আমি তার সাথী। যে আমাকে অবলম্বন করবে, আমি তাকে অবলম্বন করব। যে আমার কথা মানবে, আমি তার কথা মানব। যে আমাকে মহব্বত করে, তার মহব্বত আমার খুব জানা হয়ে যায়। ফলে, আমি তাকে নিজের জন্যে কবুল করে নিই। তাকে এমন মহব্বত করি, আমার সৃষ্টির কেউ তার উপর অগ্রণী থাকে না। যে আমাকে সত্যি সত্যি অন্বেষণ করে, সে আমাকে পায়। আর যে অন্যকে অন্বেষণ করে, সে আমাকে পায় না। হে পৃথিবীর অধিবাসীরা, তোমরা এখন দুনিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছ। একে পরিত্যাগ কর এবং আমার সম্মান, সংসর্গ ও সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হও। আমার সাথে বন্ধুত্ব কর, আমি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করব। কেননা, আমি আমার বন্ধুদের খমীর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ, মূসা কলীমুল্লাহ এবং মুহাম্মদ সফীউল্লাহর খমীর থেকে তৈরী করেছি। আমি আমার প্রতি আগ্রহীদের অন্তর নিজের নূর দ্বারা নির্মাণ করেছি এবং আমার প্রতাপ দ্বারা তাদেরকে লালিত করেছি।

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা জনৈক সিদ্দীককে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট বান্দা আমার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, আমিও তাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখি। তারা আমার প্রতি আগ্রহী, আমিও তাদের প্রতি আগ্রহী। তারা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। তারা আমার দিকে তাকায়, আমিও তাদের দিকে তাকাই। যদি তুমিও তাদের পদাংক অনুসরণ কর, তবে আমি তোমাকে মহব্বত করব। আর যদি তাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হব। সিদ্দীক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার এই সকল বান্দার পরিচয় কি? এরশাদ হল— তারা দিনের বেলায় ছায়ার প্রতি এমন উৎসুক থাকে, যেমন— রাখাল তার ছাগলের প্রতি উৎসুক থাকে। তারা সূর্যাস্তের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে; যেমন পশুপাখি সন্ধ্যায় তাদের বাসায় ফেরার জন্যে আগ্রহী হয়। অতঃপর যখন রাত এসে যায়, অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায়, শয্যা বিছানো হয়, রহস্য উন্মোচিত এবং দোস্ত দোস্তের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা আমার উদ্দেশে পা বাড়ায়, কপাল বিছায়, আমার কালামের মাধ্যমে আমার কাছে মোনাজাত করে এবং আমার নেয়ামতের উপর আমাকে খোশামোদ করে। তাদের কেউ চিৎকার করে, কেউ কান্নাকাটি করে এবং কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাদের কেউ আগ্রহী হয়ে দাঁড়ানো, কেউ বসা, কেউ রুকুকারী, কেউ সেজদাকারী। তারা আমার কারণে যা যা সহ্য করে এবং আমার কাছে অভিযোগ করে, তা সমস্তই গ্রহণ করে নিই। সর্বপ্রথম আমি তাদেরকে তিনটি বস্তু দান করব। এক, আমার নূর তাদের অন্তরে ঢেলে দেব। ফলে তারা আমার অবস্থা বর্ণনা করবে; যেমন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দেই। দুই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, যদি সবই তাদের মোকাবেলা করে, তবে আমি তাদের খাতিরে এগুলোকে কম মনে করব। তিন, আমি আমার পবিত্র মুখমণ্ডল তাদের দিকে ফিরিয়ে দেব। তুমি তো জান, আমি যার দিকে মুখ করি, তাকে কত কিছু দেই!

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনাবলীতে আরও উল্লিখিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বললেন ঃ হে দাউদ, জান্নাতকে কত স্মরণ করবে অথচ আমার কাছে আসার প্রতি আগ্রহের আবেদন করবে না? হযরত দাউদ আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার প্রতি আগ্রহী কারা? এরশাদ

হল, তারা আমার আগ্রহী, যাদেরকে আমি সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে পবিত্র করে দিয়েছি এবং ভয় সম্পর্কে অবহিত করেছি। তাদের অন্তরে আমার দিকে ছিদ্র করে দিয়েছি। সেই ছিদ্রপথে তারা আমাকে দেখে। আমি তাদের অন্তরকে হাতে নিয়ে আকাশের উপর রাখি। এরপর শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদেরকে ডাকি। তারা সমবেত হয়ে আমাকে সেজদা করে। তখন আমি তাদেরকে বলি ঃ আমি তোমাদেরকে সেজদার জন্য ডাকিনি; বরং আমি তোমাদেরকে আমার প্রতি আগ্রহীদের নিষ্কলুষ অন্তর দেখাতে চাই এবং তাদের নিয়ে গর্ব করতে চাই। তাদের অন্তর আকাশে ফেরেশতাদেরকে এমন নূর দান করে, যেমন সূর্য পৃথিবীবাসীকে কিরণ দান করে। হে দাউদ, আমি আগ্রহীদের অন্তর আপন "রেযা" দ্বারা তৈরী করেছি। নিজের চেহারার নূর দ্বারা তাদের লালন করেছি। তাদের দেহকে পৃথিবীতে আমার লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছি। তারা অন্তরের পথ দিয়ে আমাকে দেখে এবং তাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

হযরত দাউদ আরয করলেন ঃ ইলাহী, তোমার আশেকদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটিয়ে দাও। আদেশ হল ঃ লেবাননের পাহাড়ে চলে যাও। সেখানে চৌদ্দজন লোকের সাক্ষাত পাবে। তাদের মধ্যে রয়েছে যুবক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সকল প্রকার লোক। তাদের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলো যে, আমাদের কাছে তোমরা নিজেদের প্রয়োজন ব্যক্ত করো না কেন? তোমাদের পালনকর্তা সালাম জানিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন— তোমরা তো আমার বন্ধু, মনোনীত ও ওলী। আমি তোমাদের আনন্দে আনন্দিত হই এবং তোমাদের মহব্বতের দিকে অগ্রগামী হই। হযরত দাউদ নির্দেশ অনুযায়ী লেবানন পাহাড়ে গিয়ে তাদেরকে একটি ঝরণার কাছে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ঘোষণায় রত দেখলেন। তারা হযরত দাউদকে দেখেই প্রস্থানোদ্যত হলেন। হযরত দাউদ বললেন ঃ ভাইসব, আমি আল্লাহর রসূল। তাঁর একটি পয়গাম নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তারা তাঁর দিকে মুখ করে কান পেতে শুনতে লাগল। হযরত দাউদ বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই পয়গাম দিচ্ছেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রয়োজন তাঁর কাছে ব্যক্ত করবে, তাঁকে ডাকবে, যাতে তিনি তোমাদের কণ্ঠস্বর শুনেন। তোমরা তাঁর বন্ধু ও ওলী। তোমাদের খুশীতে তিনি খুশী হন। স্নেহময়ী জননী যেমন তার সন্তানদের দেখাশুনা করে, তেমনি তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের দেখাশুনা

করেন। একথা শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তাদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দোয়া করল। বৃদ্ধ দোয়ায় বলল ঃ ইলাহী, আমরা তোমার বান্দা এবং বান্দার সন্তান-সন্ততি। অতীত জীবনে আমরা যে পরিমাণ তোমাকে স্মরণ করিনি, আমাদেরকে সে পরিমাণ ক্ষমা কর। দ্বিতীয় জন বলল ঃ ইলাহী, তুমি পবিত্র। আমরা তোমার দাসানুদাস। তোমার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার রয়েছে তাতে সুদৃষ্টি দান কর। তৃতীয় জন বলল ঃ তুমি পবিত্র। আমরা কি তোমার কাছে দোয়া করার দুঃসাহস করব? তুমি জান, আমাদের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। তবে সর্বদা তোমার পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান কর। এতটুকু অনুগ্রহ আমাদের প্রতি কর। চতুর্থ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তোমার সন্তুষ্টি অন্বেষণে আমরা ত্রুটি করেছি। তুমি নিজের কৃপায় এ কাজে আমাদের সাহায্য কর। পঞ্চম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা করার গৌরব দান করেছ। অতএব, যে ব্যক্তি তোমার মাহাত্ম্যে মশগুল, সে কি তোমার সাথে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? তুমি আমাদেরকে আপন নূরের নিকটবর্তী কর— এটাই ছিল আমাদের মকছুদ। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তুমি মহান। তুমি তোমার ওলীদের নিকটে থাক। তাই তোমার কাছে দোয়া করার সাহস আমরা পাই না। সপ্তম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, তুমি আমাদের অন্তরকে যিকিরের পথ প্রদর্শন করেছ এবং তোমাতে মশগুল হওয়ার ধ্যান দান করেছ। এই নেয়ামতের শোকরে আমাদের পক্ষ থেকে যে ত্রুটি হয়েছে, তা ক্ষমা কর। অষ্টম ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ, আমাদের প্রয়োজন তো তুমি জানই। সেটা হচ্ছে কেবল তোমার দিকে দেখা। নবম ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, দাস তার প্রভুর সামনে দুঃসাহস দেখাতে পারে না। যেহেতু আপন কৃপায় আমাদেরকে দোয়ার আদেশ করেছ, তাই আরয করছি— আমাদেরকে সেই নূর দান কর, যা দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্ধকার স্তরসমূহে পথ পাওয়া যায়। দশম ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে তোমাকেই চাই। আমাদের প্রতি মনোযোগী হও এবং সর্বদা আমাদের কাছে থাক। একাদশ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, তুমি আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছ, আমরা তা পূর্ণ করার আবেদন করি। দ্বাদশ ব্যক্তি বলল ঃ এলাহী, তোমার সৃষ্টির মধ্য থেকে আমাদের কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই। কেবল কৃপাদৃষ্টি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। ত্রয়োদশ ব্যক্তি বলল ঃ

এলাহী, আমার আবেদন এই যে, দুনিয়াকে দেখার ব্যাপারে আমার চক্ষুকে অন্ধ কর এবং আখেরাতে মশগুল হওয়ার ব্যাপারে আমার অন্তরকে অন্ধ কর। চতুর্দশ ব্যক্তি বলল ঃ ইলাহী, আমি জানি তুমি ওলীদেরকে ভালবাস। অতএব, আমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ কর যে, আমাদের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে কেবল তোমাতে মশগুল করে দাও।

আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ তাদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের সকল কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা যা যা কামনা করেছ, আমি সবই কবুল করলাম। তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও এবং ভূগর্ভে কুঠরী তৈরী করে নাও। আমি তোমাদের ও আমার মধ্যবর্তী যবনিকা সরিয়ে দিতে চাই যাতে তোমরা আমার নূর ও প্রতাপ দর্শন কর। হযরত দাউদ (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, এরা এই পর্যায়ে কেমন করে উন্নীত হল? এরশাদ হল— তারা আমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদেরকে ত্যাগ করে আমার সাথে একাকী থাকে।

বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত ঃ কোরআন মজীদের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে মহব্বত রাখেন। এখন এই মহব্বতের অর্থ কি, তা জানা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এর আগে আমরা সে সব আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করছি, যেগুলোর দ্বারা এই মহব্বত প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ

অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারা তাঁকে মহব্বত করেন।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন, যারা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর পথে যুদ্ধ করে।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মহব্বত করেন তওবাকারীদেরকে ও পরিচ্ছন্নদেরকে।

আল্লাহ বান্দাকে মহব্বত করেনল— এ কারণেই যারা আল্লাহর মহব্বতের মিথ্যা দাবী করেছিল, তাদের জওয়াবে এরশাদ করেন—

অর্থাৎ, তাহলে গোনাহের কারণে তিনি তোমাদেরকে আযাব দেবেন কেন?

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اذا احب الله تعالى عبدا لا يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لاذنب له -

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন গোনাহ তার কোন ক্ষতি করে না। গোনাহ থেকে তওবাকারী গোনাহবিহীন ব্যক্তির মত।

এ হাদীসের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাহকে মহব্বত করেন, মৃত্যুর পূর্বেই তার তওবা কবুল করে নেন। এরপর অতীত গোনাহ অনেক হলেও তা তার কোন ক্ষতি করে না। যেমন, মুসলমান হওয়ার পর অতীত কুফর ক্ষতি করে না।

আল্লাহ তা'আলা মহব্বতের কারণে গোনাহ মাফ করার কথাও ঘোষণা করেছেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

অর্থাৎ, বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তিনি তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন।

রসূল আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الايمان الا من يحب -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাকে মহব্বত করেন এবং যাকে মহব্বত করেন না, উভয়কেই দুনিয়া দেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি মহব্বত করেন।

তিনি আরও বলেন—

من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن اكثر ذكر الله احبه الله -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে অবনমিত করে দেন। আর যে আল্লাহকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন।

যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এতই মহব্বত করেন যে, তাঁকে এক পর্যায়ে বলেন— যা তোমার মন চায়, তাই কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত আক্ষরিক অর্থেই মহব্বত, রূপক অর্থে নয়। কেননা, অভিধানে মহব্বতের অর্থ অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের কামনা । এ কামনা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেলে তার নাম হয় এশ্‌ক। আমরা আরও বর্ণনা করেছি যে, অনুগ্রহ ও সৌন্দর্য উভয়টিই মনের অনুকূল। উভয়টি কখনও চর্মচক্ষু এবং কখনও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুভূত হয়। অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যের উভয় প্রকার অনুভবে মহব্বত অপরিহার্য। চর্মচক্ষুতে অনুভূত হওয়াই জরুরী নয়। কিন্তু বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বত এভাবে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহর জন্যে আরও যত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যেমন শোনা, জানা ইত্যাদি মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার জন্যে একই অর্থে বলা যায় না। এমনকি অস্তিত্ব শব্দটি, যা অভিন্নতার দিক দিয়ে অত্যধিক ব্যাপক, সেটিও আল্লাহ ও মানুষের জন্যে

একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যতকিছু আছে, সব কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অনুসারী ও অনুসৃতের অস্তিত্ব এক রকম কিভাবে হতে পারে? শব্দ রচয়িতারা মহব্বত, কুদরত, ইচ্ছা, প্রভৃতি শব্দকে প্রথমে মানুষের জন্যে রচনা করেছিল। কারণ, জ্ঞান-বুদ্ধিতে মানুষই প্রথমে ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার জন্যে এসব শব্দের ব্যবহার রূপক অর্থে হয়েছে।

মহব্বত শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনুকূল বস্তুর প্রতি মনের কামনা। এটা সে মন হতে পারে, যা অনুকূল বস্তু না পাওয়া গেলে অসম্পূর্ণ থাকে এবং পাওয়া গেলে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এ অর্থে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অসম্ভব। কারণ, পূর্ণতা, সৌন্দর্য, প্রতাপ ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার কাছে বিদ্যমান এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ও অর্জিত থাকবে। আর বাস্তবে তাঁর সত্তা ও কর্ম ব্যতীত কোন কিছুই বিদ্যমান নেই। এ কারণেই শায়খ আবু সাঈদের সামনে যখন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ (আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন এবং তারা আল্লাহকে মহব্বত করে।) আয়াতখানি পাঠ করা হল, তখন তিনি বললেন ঃ তিনি নিজেকেই মহব্বত করেন। অর্থাৎ, সবকিছু তিনিই। তিনি ব্যতীত কোন কিছু বিদ্যমান নেই।

সুতরাং বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থ, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার অন্তর থেকে যবনিকা উন্মোচিত করে দেয়া। ফলে, বান্দা তাঁকে অন্তর দিয়ে দেখতে অথবা তিনি বান্দাকে নৈকট্যলাভে সক্ষম করে দেন। এসব কাজ অর্থাৎ যবনিকা উন্মোচিত করা অথবা নৈকট্যলাভে সক্ষম করা সমস্তই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপায় হবে। বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের অর্থ তাই।

এখন প্রশ্ন হল, বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত একটি অস্পষ্ট ব্যাপার। আমরা কিরূপে জানব, এই বান্দা আল্লাহ তা'আলার মাহবুব? জওয়াব, এর কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায়, সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতপ্রাপ্ত। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اذا احب الله عبدا ابتلاه فاذا احبه الحب البالغ اقتناه

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন

তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। যখন তাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মহব্বত করেন, তখন তাকে খাঁটি করে নেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে "খাঁটি করে নেন" কথার মর্মার্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ অর্থাৎ তার কাছে ধন ও জন বলতে কিছুই রাখেন না। এ থেকে জানা গেল, বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের পরিচয় হল আল্লাহ তাকে গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেবেন এবং বান্দা ও গায়রুল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেবেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে কোন এক ব্যক্তি আরয করল ঃ আপনি সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চর ক্রয় করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় নয়, তিনি আমাকে নিজের সত্তা থেকে আলাদা করে খচ্চরের ব্যস্ততা দান করবেন। হাদীসে আছে—

اذا احب الله عبدا ابتلاه فأن صبر اجتباه وان رضى اصطفاء

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। যদি সে সবর করে, তবে তাকে নির্বাচিত করে নেন, আর যদি সে রাযী থাকে, তবে মনোনীত করে নেন।

অন্য এক হাদীসে আছে—

اذا احب الله عبدً اجعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يامره وينهاه -

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তার জন্যে তার নিজের মধ্য থেকে একজন উপদেশদাতা এবং অন্তরের তরফ থেকে একজন সতর্ককারী নিযুক্ত করে দেন। সে তাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।

মোটকথা, এসব লক্ষণের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রমাণিত হয়। এছাড়া, আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বতও এই মহব্বতের একটি দলীল।

এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার মহব্বতেরও কিছু লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত দাবী করা খুবই সহজ। কিন্তু এর বাস্তবতা খুবই বিরল। শয়তানের প্ররোচনায়ও মন অনেক সময় খোদায়ী মহব্বত দাবী করে। মহব্বতের আলামত দ্বারা মনের পরীক্ষা না নেওয়া পর্যন্ত এ দাবীতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। মহব্বত একটি বৃক্ষ, যার শিকড় পৃথিবীতে এবং শাখাপল্লব উর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত। এর ফল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায় এবং এর দ্বারা মহব্বতের অস্তিত্ব জানা যায়। যেমন, ধোঁয়া দেখলে আগুনের অস্তিত্ব জানা যায়। এ ধরনের আলামত বা লক্ষণ অনেক। এক, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতকে প্রিয় জ্ঞান করবে। কেননা, মহব্বতের পর মাহবুবের সাক্ষাত কামনা করাই স্বাভাবিক। এটা জানা কথা যে, দুনিয়া থেকে প্রস্থান ব্যতীত এই বাসনা পূর্ণ হবে না। তাই মৃত্যুকে মহব্বত করা ও তাকে অপ্রিয় মনে না করাও জরুরী। কেননা, মাশুকের দেশে যাওয়ার জন্যে এবং তার দীদার দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার জন্যে সফর করা আশেকের কাছে অপ্রিয় মনে হয় না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন—

من احب لقاء الله احب الله لقاءه -

অর্থাৎ, যে আল্লাহর তা'আলা সাক্ষাত পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাত পছন্দ করেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের পর বান্দার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় যে স্বভাবটি প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে অধিক পরিমাণে সেজদা।

আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা সত্য মহব্বত বলে এরশাদ করেছেন। সেমতে মুসলমানরা যখন খোদায়ী মহব্বতের দাবী করল, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকেই মহব্বত করেন, যারা তাঁর পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে।

আরও বলা হয়েছে—

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -

অর্থাৎ, যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর মারে ও মরে।

এখানে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার বাসনাকে মহব্বতের আলামত বলা হয়েছে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে যে ওসিয়ত করেন, তাতে বলা হয়েছে— সত্য কথা অসহনীয়। এতদসত্ত্বেও তা প্রিয়। মিথ্যা হালকা হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও তা মন্দ। যদি তুমি আমার উপদেশ মনে রাখ, তবে মৃত্যুর চেয়ে অধিক কোন অনুপস্থিত বস্তু তোমার কাছে প্রিয় হবে না, যার আগমন সুনিশ্চিত। আর যদি এ উপদেশকে এড়িয়ে যাও, তবে কোন অনুপস্থিত বস্তু তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ হবে না; অথচ তুমি একে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।

সাঈদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁর পুত্র ইসহাকের কাছে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আমার কাছে এসে বললেন ঃ এস, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি। অতঃপর এক পার্শ্বে চলে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি— আগামীকাল যুদ্ধে যেন আমার মোকাবিলা কোন ভয়ংকর ক্রুদ্ধ বীরপুরুষের সাথে হয়। আমি তার সাথে এবং সে আমার সাথে লড়বে। অতঃপর সে আমাকে ভূতলশায়ী করে আমার নাক-কান কেটে দেবে এবং আমার পেট চিরবে। কিয়ামতে যখন আমি তোমার সামনে যাব, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ, তোমার নাক-কান কে কাটল? আমি আরয করব— ইলাহী, তোমার পথে এবং তোমার রসূলের পথে আমার এই দশা হয়েছে। হযরত সাঈদ বললেন ঃ আমি যুদ্ধের শেষ দিন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নাক ও কান সুতায় বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখেছি। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন ঃ আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের অবশিষ্ট কসমও পূর্ণ করবেন।

হযরত সুফিয়ান ছওরী ও বিশরে হাফী (রহঃ) বলেন ঃ সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিই মৃত্যুকে খারাপ মনে করে। কারণ, হাবীব কোন অবস্থায় মাহবুবের সাক্ষাতকে খারাপ মনে করে না।

বুয়ায়তী জনৈক দরবেশকে জিজ্ঞেস করলে ঃ তুমি কি মৃত্যুকে মহব্বত কর? দরবেশ নিরুত্তর রইলেন, তিনি বললেন ঃ তুমি সত্যিকার দরবেশ হলে মৃত্যুকে প্রিয় মনে করতে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

দরবেশ বলল ঃ এক হাদীসে তো রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। বুয়ায়তী বললেন, এই নিষেধাজ্ঞা তখন, যখন বান্দার উপর কোন মুসীবত নাযিল হয়। অর্থাৎ, মুসীবতের কারণে যেন কেউ মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকা তাঁর হুকুম থেকে পলায়ন করার চেয়ে উত্তম।

এখন প্রশ্ন হয়, মৃত্যুকে মহব্বত না করে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করতে পারে কি না? জওয়াব এই যে, মৃত্যুকে মহব্বত না করার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছেদের দুঃখ। এতে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে ত্রুটি থাকে। কিন্তু দুনিয়া ও স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের মহব্বতের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার প্রতিও কিছু দুর্বল মহব্বত থাকা কঠিন নয়। মহব্বতে মহব্বতে তফাৎ থাকা তো একটা স্বীকৃত সত্য। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনা।

হযরত হুযায়ফা ইবনে ওতবা নিজের ভাগিনী ফাতেমাকে তারই মুক্ত ক্রীতদাস সালেমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এতে কোরায়শ বংশের লোকেরা ঘোর আপত্তি তুলতে লাগল ঃ তুমি একজন কোরায়শী মহিলার বিবাহ একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে কেমন করে দিলে? হুযায়ফা জওয়াব দিলেন ঃ সালেম ফাতেমার চেয়ে উত্তম— একথা জেনেই আমি বিয়ে দিয়েছি। এই জওয়াব কোরায়শদের কাছে বিয়ের চাইতেও অধিক দুঃসহ মনে হল। তারা বলল ঃ এটা কিরূপে সম্ভব? ফাতেমা তো তোমার ভাগিনী এবং সালেম তোমার মুক্ত ক্রীতদাস! হুযায়ফা বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কাউকে দেখতে চায়, যে আল্লাহ তা'আলাকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে, সে যেন সালেমকে দেখে। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিছু লোক আল্লাহকে সর্বান্তকরণে মহব্বত করে না; বরং তারা দুনিয়ার সাথেও মহব্বত রাখে। অতএব, তারা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে যাবে, তখন দীদারের আনন্দ মহব্বত পরিমাণেই পাবে। পক্ষান্তরে তারা দুনিয়ার সাথে যে পরিমাণে মহব্বত রাখবে, দুনিয়া ত্যাগ করার সময় সে পরিমাণে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ভোগ করবে।

মৃত্যুকে খারাপ মনে করার আরেক কারণ হল, বান্দা মহব্বতের প্রাথমিক স্তরে থাকার কারণে তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসাকে খারাপ মনে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সাথে মোলাকাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর আগমনকে খারাপ মনে করে। এতে মহব্বত কম হওয়ার অবস্থা বুঝায় না। বরং তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন আশেক তার মাশুকের আগমনবার্তা শুনে চায় যে, মাশুক কিছুদিন পরে আসুক, যাতে তার জন্যে ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে নেওয়া যায় এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়া যায়। ফলে মাশুক আসার পর স্বচ্ছন্দে তার সাথে সাক্ষাত করা যাবে এবং কোন অসুবিধা থাকবে না। সুতরাং এই জাতীয় কারণে মৃত্যুকে খারাপ মনে করা পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থী নয়। এর পরিচয় হচ্ছে আসলে পুরাপুরি যত্নবান হওয়া এবং চিন্তাকে আখেরাতের প্রস্তুতিতে ডুবিয়ে রাখা।

মহব্বতের আরও একটি আলামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের প্রিয়বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেয়া, এর জন্যে কঠিনতর আমল বাস্তবায়িত করা এবং শৈথিল্য ও অলসতা পরিহার করে সার্বক্ষণিক এবাদতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রত্যাশী হওয়া। এরূপ আত্মত্যাগীদের প্রশংসায় কোরআন মজীদে বলা হয়েছে—

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

অর্থাৎ, তারা তাদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। তারা যা প্রাপ্ত হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কোন কৌতূহল নেই। নিজেরা ক্ষুধাপীড়িত হলেও তারা তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

আর যে ব্যক্তি সব সময় নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, তার মাহবুব খেয়ালখুশীই হবে। আশেক তো তার মাশুকের ইচ্ছার অনুসরণ করে। তার ইচ্ছার সামনে নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দেয়। বরং খোদায়ী এশক যখন প্রবল হয়, তখন মাশুক ছাড়া সবকিছুর মূলোৎপাটন করে ছাড়ে। যেমন, বর্ণিত আছে, যুলায়খা যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে বিহাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল, তখন তাকে ছেড়ে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হল এবং তাঁরই হয়ে রইল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে দিনের বেলায় কাছে পেতে চাইলে যুলায়খা রাতের কথা বলে এড়িয়ে যেত এবং রাতে দিনের ওয়াদা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। বলত ঃ হে ইউসুফ, আমি আপনাকে তখন মহব্বত করতাম, যখন আল্লাহ তা'আলাকে জানতাম না। এখন তাঁকে চিনেছি। এখন তাঁর মহব্বত আমার অন্তরে অন্য কারো মহব্বতের জন্যে জায়গা রাখেনি। আমি এই মহব্বতের কোন বিনিময়ও চাই না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ, তুমি যুলায়খার সাথে সহবাস কর। তার গর্ভ থেকে তোমার দুটি পুত্র সন্তান হবে। আমি তাদের উভয়কে নবী করব। যুলায়খা আরয করল ঃ যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই আদেশ দিয়ে থাকেন এবং আমাকে এই নিয়ামতের মাধ্যম করে থাকেন, তবে আমি তাঁর ইচ্ছা শিরোধার্য করে নেব এবং সহবাসে সম্মত হব। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করে, সে তার আদেশ অমান্য করে না।

এখন জানা উচিত, নাফরমানী তথা আদেশ অমান্য করা মূল মহব্বতের পরিপন্থী নয়; বরং পূর্ণ মহব্বতের পরিপন্থী। উদাহরণতঃ মানুষ নিজেকে মহব্বত করে। সে যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন রোগমুক্তিকে মহব্বত করে। এতদসত্ত্বেও সে এমন বস্তু খেয়ে ফেলে, যা তার জন্যে ক্ষতিকর; অথচ সে জানে তা খেলে তার রোগ বেড়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বলা হয় না যে, সে নিজেকে মহব্বত করে না। বরং বলা হয়, তার জ্ঞান কম এবং খাহেশ প্রবল। তাই মহব্বতের দাবীর উপর কায়েম থাকতে অক্ষম। নাফরমানী যে মূল মহব্বতের পরিপন্থী নয়, এর প্রমাণ এ ঘটনা। নোমান নামক জনৈক মুসলমান পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘন ঘন ধৃত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আনীত হত। একবার তাকে ধরে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উপর শরীয়তের শাস্তি "হদ" জারি করলেন। অতঃপর জনৈক সাহাবী তাকে লানত করলে রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তাকে লানত করো না। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করে। এখানে তিনি গোনাহের কারণে নোমানকে মহব্বত থেকে খারিজ করে দেননি। হ্যাঁ, গোনাহ মানুষকে পূর্ণ মহব্বত থেকে খারিজ করে দেয়। জনৈক সাধক বলেন ঃ যখন মানুষের ঈমান অন্তরের বাহ্যিক অংশে থাকে,

তখন সে আল্লাহ তা'আলার সাথে মাঝারি ধরনের মহব্বত রাখে। আর যখন ঈমান অন্তরের অন্তস্তলে চলে যায়, তখন পূর্ণ মহব্বত রাখে এবং গোনাহ পরিত্যাগ করে।

মহব্বতের দাবী করা বিপদমুক্ত নয়। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ তোমাকে আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখ কি না, এ প্রশ্ন করা হলে তুমি চুপ থাকবে, জওয়াব দিবে না। কেননা, যদি বল "না", তবে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি হাঁ বল, তবে তোমার গুণাবলী মজনুনের মত নয়। অতএব, আল্লাহর গযবকে ভয় কর এবং মিথ্যা দাবী করো না। জনৈক আলেম বলেন ঃ জান্নাতে মহব্বতকারীদের সুখ ও আনন্দের চেয়ে বড় কোন সুখ ও আনন্দ নেই। আর দোযখেও সে ব্যক্তির আযাবের চেয়ে বড় কোন আযাব নেই, যে মহব্বতের দাবী করে, অথচ মহব্বতের কোন বিষয় তার মধ্যে নেই।

মহব্বতের আরেক আলামত হচ্ছে, যিকিরের প্রতি অত্যধিক উৎসাহী হওয়া এবং যিকির থেকে অন্তরাশূন্য না থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর সাথে মহব্বত রাখে, সে তার যিকির তথা স্মরণ অনেক বেশী করে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহকেও অত্যধিক স্মরণ করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বতের লক্ষণ হবে তাঁর যিকির কে মহব্বত করা, তাঁর কালাম অর্থাৎ কোরআন মজীদকে মহব্বত করা এবং তাঁর রসূলকে মহব্বত করা। এমনিভাবে যে বস্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাকেও মহববত করা। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে মহব্বত করলে মাহবুবের গলির কুকুরকেও মহব্বত করতে থাকে। মহব্বত শক্তিশালী হয়ে গেলে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। একে মহব্বতে অংশীদারিত্ব মনে করা ভুল। কেননা, মাহবুব আল্লাহর রসূলকে এজন্যে মহব্বত করবে যে, তিনি তাঁর রসূল। এটা হুবহু মাহবুবকেই মহব্বত করা— অপরকে নয়। যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রবল হয়ে যায়, সে সমগ্র সৃষ্টিকে মহব্বত করতে থাকে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টি যে মাহবুবেরই সৃষ্টি। সুতরাং কালামে পাক, রসূলে করীম (সাঃ) এবং ওলামায়ে কেরামকে মহব্বত না করে উপায় আছে কি? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, হে নবী বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তবে

আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

احبوا الله لما يغزوكم به من نعمة واحبونى لله –

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে এজন্যে মহব্বত কর যে, তিনি তোমাদের নেয়ামত দিয়ে লালন-পালন করেন। আর আমাকে মহব্বত কর আল্লাহর জন্যে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতকারীকে মহব্বত করে, সে আল্লাহকে মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর তাযীমকারীর তাযীম করে, সে আল্লাহরই তাযীম করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোরআন ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন না করে। কেননা, যে কোরআনকে মহব্বত করে, সে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করে। যদি কোরআনের সাথে মহব্বত না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত হবে না।

হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ খোদায়ী মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে কোরআন মজীদের মহব্বত। আল্লাহ তা'আলা ও কোরআনের সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে মহব্বত। তাঁর সাথে মহব্বতের পরিচয় হচ্ছে তাঁর সুন্নাহর সাথে মহব্বত। সুন্নাহর সাথে মহব্বতের লক্ষণ হচ্ছে আখেরাতের মহব্বত। আখেরাত যে প্রিয় তার পরিচয় হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা। আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার আলামত হচ্ছে দুনিয়া থেকে আখেরাতের পাথেয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করা।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে একান্ত বাস, মোনাজাত ও কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি অনুরক্ত হওয়া এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া। হাবীবের সাথে একান্তে বাস ও মোনাজাতের আনন্দকে সুখ মন করা এই মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর। অতএব, যে ব্যক্তির কাছে নিদ্রা ও পারস্পরিক গল্পগুজব মোনাজাতের তুলনায় উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক, তার মহব্বত কেমন করে সঠিক হবে? হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম যখন পাহাড় থেকে অবতরণ করেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কোত্থেকে আসলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনাবলীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ আমার সৃষ্টির কারও প্রতি অনুরক্ত হয়ো না। কারণ, আমি

দু'প্রকার লোককে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেই । এক, যে আমার ছওয়াবকে বিলম্বিত জেনে আলাদা হয়ে যায় এবং দুই, যে আমাকে বিস্মৃত হয়ে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এর পরিচয় এই যে, আমি তাকে তার নিজের হাতে সোপর্দ করি এবং দুনিয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছেড়ে দেই।

মানুষ যদি গায়রুল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে যে পরিমাণ অনুরাগ হবে, আল্লাহ থেকে সে পরিমাণ দূরত্ব হয়ে যাবে এবং মহব্বত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

বরখ ছিল একজন কাফ্রী গোলাম এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র। হযরত মূসা (আঃ) তার ওসিলায় বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন। তার বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন ঃ বরখ ভাল লোক। কিন্তু তার মধ্যে একটি দোষ আছে। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ ইলাহী, তার দোষ কি? এরশাদ হল ঃ ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু তার খুব পছন্দ। সে এর প্রতি অনুরক্ত। যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, সে কোন বস্তুর প্রতি অনুরক্ত হয় না।

বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ কোন এক জঙ্গলে দীর্ঘ দিন আল্লাহ তা'আলার এবাদত করে। অতঃপর সে দেখে, একটি পাখী এক গাছের উপর বাসা তৈরী করে তাতে বসে কিচিরমিচির করছে। আবেদ মনে মনে বলল ঃ এই গাছের নীচে এবাদতের জায়গা করে নিলে পাখীর ডাক শুনে মন বেশ প্রফুল্ল থাকবে। অতঃপর সে গাছের নীচে বসে এবাদত শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ অমুক আবেদকে জানিয়ে দাও, সে আমার সৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তার মর্তবা হ্রাস করে দিলাম, যা আর কোন আমল দ্বারা পূর্ণ হবে না।

মোটকথা, আশেক তাকেই বলে, যে মাশুক ছাড়া প্রশান্তি পায় না। কোরআন পাকে আছে—

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। শুন, অন্তরসমূহ আল্লাহকে সরণ করেই প্রশান্তি পেতে পারে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ এখানে প্রশান্তির অর্থ খুশী ও আন্তরিক অনুরাগ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্ভেজাল খোদায়ী মহব্বতের স্বাদ আস্বাদন করে, এ স্বাদ তাকে দুনিয়ার পেছনে ছুটাছুটি থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার মহব্বত দাবী করে, অথচ রাতের বেলায় গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে তাকে, সে মিথ্যুক। যে নিজের মাহবুবের সাক্ষাত পছন্দ করে না, সে কেমন মহব্বতকারী! আমি রাতের বেলায় যারা আমাকে চায়, তাদের জন্যে বিদ্যমান থাকি। সে সাচ্চা হলে আমাকে তখন চাইত।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয় না, সে আল্লাহর আশেক নয়— আল্লাহর কালামকে মানুষের কালামের উপর, আল্লাহর সাক্ষাতকে মানুষের সাক্ষাতের উপর এবং আল্লাহর এবাদতকে জনসেবার উপর।

মহব্বতের এক আলামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছু হাত-ছাড়া হয়ে যায়, তার জন্য পরিতাপ না করা। কিন্তু কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গেলে সেজন্য নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করা এবং গাফেল হওয়ার সাথে সাথে তওবা ও এস্তেগফার করা কর্তব্য। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কিছু সংখ্যক বান্দা তাঁকে মহব্বত করার পর তাঁকে নিয়েই প্রশান্ত। বেহাত বস্তুর জন্যে তারা কোন দুঃখ করে না।

মহব্বতের এক আলামত আল্লাহ তা'আলার এবাদতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং এবাদতে কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করা। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বিশ বছর পর্যন্ত রাতের বেলায় বিপদ সহ্য করেছি। এরপর এর মাধ্যমে বিশ বছর আনন্দ করেছি। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ মহব্বতের আলামত সর্বদা প্রফুল্ল থাকা এবং এমন চেষ্টা করা, যাতে দেহ ক্লান্ত হয় এবং অন্তর ক্লান্ত না হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ আসলে মহব্বতের কোন ক্লান্তি নেই। জনৈক আলেম বলেন ঃ মহব্বতকারী অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলেও এবাদতে কখনও তৃপ্ত হয় না। বাস্তব জগতেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আশেক তার মাশুকের মহব্বতে চেষ্টা করতে ত্রুটি করে না এবং তার খেদমত করাকে আন্তরিকভাবে ভাল মনে করে। দেহের জন্য

কষ্টকর হলেও সে এতেই আনন্দ পায়। দেহ অক্ষম হয়ে গেলে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে, যাতে আবার খেদমতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রবল হয়ে গেলেও তেমনি এবাদত ও খেদমতের চেয়ে উত্তম কোন কিছু থাকে না। যে বস্তুর মহব্বত মানুষের মধ্যে প্রবল হয়, তা তার নীচের বস্তুকে নির্মূল করে দেয়। উদাহরণতঃ কারও মহব্বত ধন-সম্পদের মহব্বতের তুলনায় বেশী হলে তার জন্যে ধন-সম্পদ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। জনৈক খোদাপ্রেমিক তার জানমাল সমস্তই উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করা হল ঃ মহব্বতে তোমার এ অবস্থা কিরূপে হল? সে উত্তর দিল ঃ আমি একদিন এক আশেকের নির্জনে তার মাশুকের সাথে একথা বলতে শুনেছিলাম— আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে সর্বান্তকরণে ভালবাসি। কিন্তু তুমি কেন জানি মুখ ফিরিয়ে রাখ। মাশুক বলল ঃ যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে বল আমার জন্যে কি ব্যয় করবে? আশেক বলল ঃ প্রথমে আমি যেসব বস্তুর মালিক, সেগুলো সব তোমাকে দিয়ে দেব। এরপর তোমার জন্যে আমার প্রাণ উৎসর্গ করব। তুমি সম্মত হয়ে যাও। এই কথাবার্তা শুনে আমি ভাবলাম, যদি মানুষ মানুষের জন্যে এরূপ করতে পারে, তবে মাবুদের সাথে বান্দার কিরূপ করা উচিত। আমার মহব্বতের উন্নতির এটাই কারণ।

আল্লাহ তা'আলার সকল বান্দার প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু হওয়াও মহব্বতের একটি লক্ষণ। আল্লাহ পাক বলেন—

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের উপর কঠোর এবং পরস্পর দয়ালু।

এ ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনায় প্রভাবিত না হওয়া উচিত এবং আল্লাহর জন্যে ক্রুদ্ধ হওয়ার পথে কোন বাধা না থাকা কর্তব্য। এক হাদীসে কুদসীতে ওলীদের এ গুণই উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে— তারাই আমার ওলী, যারা আমার মহব্বতে পাগলপারা, যেমন শিশু কোন বস্তুর জন্যে পাগলপারা হয়ে থাকে। তারা আমার যিকিরের দিকে এমন ধাবিত হয়, যেমন পশু-পাখি তাদের বাসার দিকে ধাবিত হয়। তারা আমার নিষিদ্ধ কাজকর্ম দেখে ক্রোধে বাঘের মত গর্জন করে; মানুষ কম

না বেশী, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এই দৃষ্টান্তটি অনুধাবন করা দরকার। শিশুর মন কোন বস্তুতে লেগে গেলে সে তা থেকে কখনও আলাদা হয় না। কেউ সেই বস্তু নিয়ে গেলে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সে চীৎকার করতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার সময়ও বস্তুটি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ঘুমায়। জাগ্রত হলে আবার হাতে তুলে নেয়। বস্তুটি হারিয়ে গেলে কাঁদে এবং পেয়ে গেলে হাসতে থাকে। বাঘও ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ক্রোধের তীব্রতায় সে নিজেকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অতএব, এগুলো হচ্ছে মহব্বতের আলামত। যার ভেতরে এসব বিষয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তার মহব্বত পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি। আর যার মহব্বতে গায়রুল্লাহর মহব্বতের মিশ্রণ থাকবে, সে আখেরাতে মহব্বত পরিমাণই শান্তি পাবে।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের অর্থ ঃ পূর্বেই লিখিত হয়েছে, অনুরাগ, ভীতি ও আগ্রহ মহব্বতের অন্যতম ফল। কিন্তু এসব ফল অবস্থা ভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যখন মহব্বতকারী আল্লাহর প্রতাপ ও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা বুঝে নেয় এবং অবস্থাটি প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন অন্তর তাঁর অন্বেষণে উত্তেজিত থাকে। অন্তরের এই উত্তেজনাকে "শওক" তথা আগ্রহ বলা হয়। যখন মহব্বতকারীর উপর খোদায়ী সৌন্দর্য ও নৈকট্যের আনন্দ প্রবল হয়, তখন অন্তরের এই আনন্দ ও খুশীর ভাবকে "উন্স" তথা অনুরাগ বলা হয়। মহব্বতকারীর দৃষ্টি কখনও মাহবুবের শক্তি, অমুখাপেক্ষিতা, বেপরওয়াভাব ইত্যাদি গুণাবলীর প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং এগুলো জানার কারণে মনে ব্যথা থাকে। অন্তরে এ ধরনের দুঃখের ভাব প্রবল হয়ে গেলে তাকে বলা হয় 'খওফ' তথা ভীতি।

যার মধ্যে অনুরাগ প্রবল, সে নির্জনতাপ্রিয় হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম পাহাড় থেকে অবতরণ করলে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আপনি কোত্থেকে আসছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর প্রতি অনুরাগ থেকে।

যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হয়, গায়রুল্লাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া তার জন্যে অপরিহার্য। বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেন, তখন কিছুদিন পর্যন্ত মানুষের কথাবার্তা শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এর কারণ, মাহবুবের কথা ও তাঁর প্রতি অনুরাগ এত মিষ্ট যে, অন্য বস্তুর মিষ্টতা অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে যায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী করেন— হে

দাউদ, আমারই আগ্রহী এবং আমারই প্রতি অনুরাগী হও। অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হও।

আবদুল ওয়াহেদ ইবন যায়দ বলেন— আমি জনৈক দরবেশের কাছে গিয়ে বললাম ঃ তুমি খুব নির্জনতা পছন্দ কর? সে বলল ঃ মিঞা সাহেব, আপনি যদি নির্জনতার স্বাদ আস্বাদন করেন, তবে নিজেকেও ঘৃণা করতে শুরু করবেন। নির্জনতাই তো এবাদতের মূল শিকড়। আমি শুধালাম ঃ তুমি নির্জনতার সর্বনিম্ন উপকার কি পেয়েছ? সে বলল ঃ মানুষের তোষামোদ থেকে মুক্তি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা। আমি বললাম ঃ মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরাগের মিষ্টতা কখন পায়? সে বলল ঃ যখন মহব্বত পরিষ্কার এবং আদান-প্রদান খাঁটি হয়। আমি শুধালাম ঃ মহব্বত কখন পরিষ্কার হয়? সে বলল ঃ যখন এবাদতে কোন চিন্তা অবশিষ্ট না থাকে।

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের বিশেষ আলামত হচ্ছে জনকোলাহলে অস্বস্তিবোধ করা এবং খোদায়ী এবাদতের মিষ্টতা আস্বাদনে তীব্র লোভী হওয়া। এমতাবস্থায় অনুরাগী ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করলেও এমনভাবে করবে যেন সে জনসমাবেশের মধ্যেও একা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ অনুরাগী ব্যক্তিরা কেবল দৈহিকভাবে দুনিয়াকে সঙ্গ দেয়। তাঁদের আত্মা উচ্চতম প্রাসাদে নিবদ্ধ। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার নায়েব এবং তাঁর ধর্মের প্রতি আহ্বায়ক।

অনুরাগের প্রাবল্য ঃ অনুরাগ যখন স্থায়ী, প্রবল ও মযবুত হয়ে যায়, তখন তা মোনাজাতে এক প্রকার সন্তুষ্টি ও খোলাখুলি ভাব সৃষ্টি করে, যা মাঝে মাঝে বাহ্যত মন্দ হয়ে থাকে। কারণ, এতে থাকে দুঃসাহস ও নির্ভীকতা। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরাগের স্তরে অবস্থান করে, তার এই খোলাখুলি ভাব সহ্য করে নেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে অবস্থান না করে কথায় ও কাজে অনুরাগীদের ন্যায় সাহসিকতা দেখায়, সে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। বরখে আসওয়াদের মোনাজাত এর দৃষ্টান্ত। তার সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ করা হয় বনী ইসরাঈলের নিমিত্ত বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে তাকে অনুরোধ কর। বরখে আসওয়াদের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

বনী ইসরাঈলের দেশে সাত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ বিরাজ করলে হযরত মূসা (আঃ) সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির দোয়া

করতে বের হন এবং দোয়া করেন। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন— যারা গোনাহে আচ্ছন্ন, আন্তরিকভাবে পাপিষ্ঠ, বিশ্বাস ছাড়াই দোয়া করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে না, তাদের দোয়া আমি কেমন করে কবুল করব? তুমি আমার এক বান্দার কাছে যাও। যার নাম বরখ। তাকে বল বাইরে এসে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে, যাতে আমি কবুল করি। হযরত মূসা (আঃ) বরখের খোঁজ নিলে কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। একদিন তিনি জনৈক হাবশী গোলামকে পথিমধ্যে দেখতে পেলেন। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে সেজদার ধূলি লেগেছিল এবং গলায় একটি চাদর জড়ানো ছিল। তিনি খোদা প্রদত্ত নূরের মাধ্যমে তাকে চিনলেন এবং নাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে বলল ঃ আমার নাম বরখ। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমি তো দীর্ঘদিন ধরে তোমাকেই খুঁজছি। আমার সঙ্গে চল এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া কর। বরখ তার সঙ্গে বের হল এবং এভাবে দোয়া করল ঃ এলাহী, এটা তোমার কাজও নয়, হুকুমও নয়। তোমার কি হল যে, অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে রেখেছ? তোমার নিকটস্থ নদী-নালা শুকিয়ে গেছে কি? না বায়ু তোমার আনুগত্য স্বীকার করছে না? না গোনাহগারদের প্রতি তোমার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে? গোনাহগারদের সৃষ্টি করার পূর্বে তুমি ক্ষমাকারী ছিলে না কি? তুমিই তো রহমত সৃষ্টি করেছ এবং অনুগ্রহের আদেশ করছ। এখন কি আমাদেরকে দেখাচ্ছ যে, তোমার কাছ পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না? মোটকথা, সে দোয়ার মধ্যে এমনি ধরনের উচিত-অনুচিত কথাবার্তা বলতে লাগল। অবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং বনী ইসরাঈল সিক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলার আদেশে ঘাস গজিয়ে উঠল এবং দ্বিপ্রহর অবধি উরু পর্যন্ত উঁচু হয়ে গেল। এরপর বরখ স্বস্থানে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে সে বলল ঃ আমি আমার রবের সঙ্গে কেমন বিবাদ করেছি! তিনি আমার সাথে ইনসাফ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন— বরখ আমাকে দিনে তিনবার হাসায়।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— একবার বসরায় অগ্নিকাণ্ডে অনেক কুঁড়েঘর ভস্মীভূত হয়ে গেল; কিন্তু সেগুলোর মাঝে একটি কুঁড়েঘর সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেল। তখন বসরার গভর্নর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী

(রাঃ)। তিনি এই অভূতপূর্ব ঘটনার সংবাদ পেয়ে সে কুঁড়েঘরের মালিককে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল সে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি? তোমার কুঁড়েঘর জ্বলেনি কেন? সে বলল ঃ আমি আমার ঘরটি ভস্মীভূত না করার জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে কসম দিয়েছিলাম। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হবে, যাদের মাথার কেশ থাকবে বিক্ষিপ্ত এবং পোশাক হবে মলিন। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলাকে কোন বিষয়ে কসম দিলে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেখাবেন।

হযরত হাসান থেকে আরও বর্ণিত আছে, বসরায় একবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলে আবু ওবায়দা খাওয়াস সেখানে আগমন করলেন এবং আগুনের উপর চলতে লাগলেন। বসরার শাসনকর্তা আরয করলেন ঃ দেখুন, আপনি জ্বলে না যান। তিনি বললেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আগুনে না জ্বালানোর জন্যে আমি আল্লাহ পাককে কসম দিয়ে রেখেছি। শাসনকর্তা বললেন ঃ তাহলে আগুনকেও নিভে যাওয়ার জন্যে কসম দিন। তিনি আগুনকে কসম দিলেন এবং তা নিভে গেল।

একদিন আবু হাফস (রঃ) পথ চলছিলেন, এমন সময় এক ধোপা সামনে এল। সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার উপর কি বিপদ এল? সে বলল ঃ আমার একমাত্র সম্বল গাধাটি হারিয়ে গেছে। এখন আমি কি করি? একথা শুনে আবু হাফস থেমে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন ঃ তোমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, আমি এক পা-ও সামনে এগুব না যে পর্যন্ত তুমি এই ব্যক্তির গাধা তার কাছে পৌঁছিয়ে না দেবে। একথা বলার সাথে সাথে গাধা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তিনি সামনে এগুলেন।

এগুলো হচ্ছে অনুরাগীদের কর্মকাণ্ড। অন্যদের এরূপ করার অধিকার নেই। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) বলেন ঃ অনুরাগীরা তাদের কথাবার্তায় ও নির্জন মোনাজাতে এমন সব কথা বলেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে কুফর হয়ে থাকে। তারা এগুলো শুনলে অনুরাগীদেরকে সোজা কাফের বলতে শুরু করবে। অথচ এসব বিষয়ে অনুরাগীরা নিজেদের উন্নতি অনুভব করেন। তাদের জন্যেই এসব কথাবার্তা শোভনীয়— অন্যদের জন্যে নয়।

এমনটাও অসম্ভব নয় যে, একই কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা এক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট— যদি উভয়ের অবস্থান তথা মকাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে কোরআন পাকে এ বিষয়ে অনেক ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাকের সমস্ত কিস্সা-কাহিনী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের অমূল্য ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কিছু নয়। আর যারা স্বল্পবুদ্ধি তাদের কাছে এগুলো নিছক কিসসা-কাহিনী। উদাহরণতঃ প্রথম কিস্সা হচ্ছে হযরত আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসের। গোনাহ্ ও বিরুদ্ধাচরণে তারা উভয়েই অংশীদার ছিলেন। কিন্তু যে গোনাহের পর ইবলীস রহমত থেকে বিতাড়িত হল এবং অভিশাপের বেড়ি গলায় পরল, সে গোনাহের পরই হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ হল—

وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى-

অর্থাৎ, আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল। ফলে, সে পথভ্রষ্ট হল। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথপ্রদর্শন করলেন।

আল্লাহ তা'আলা রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে এক বান্দার প্রতি মনোনিবেশ করাও অন্য বান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন। অথচ তারা উভয়েই ছিল আল্লাহর বান্দা; কিন্তু তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এরশাদ হয়েছে—

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى-

অর্থাৎ, যে আপনার কাছে সোৎসাহে ও ভয়ার্তচিত্তে আসল, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।

আর অন্য বান্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى -

অর্থাৎ, যে বিত্তশালী, আপনি তার প্রতি মনোযোগী।

অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক শ্রেণীর লোকের সাথে বসতে বলা হয়েছে এবং অন্য একশ্রেণীর লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে আছে—

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ -

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনি বলুন, তোমাদের প্রতি সালাম।

আরও এরশাদ হয়েছে—

فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ -

অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের পালনকর্তাকে ডাকে।

অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে—

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيْٓ اٰيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِيْ حَدِيثٍ غَيْرِهٖ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াত সম্পর্কে প্রলাপোক্তি করে, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রলাপোক্তি করে। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।

এমনিভাবে কোন কোন বান্দার পক্ষ থেকে মহব্বতের ছলনা ও গর্ব সহ্য করা হয় এবং কোন কোন বান্দার তরফ থেকে সহ্য করা হয় না। উদাহরণতঃ হযরত মূসা (আঃ) অনুরাগের আনন্দের ছলে আরয করেছিলেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ

অর্থাৎ, এগুলো সব তো তোমার পরীক্ষা, যা দ্বারা যাকে ইচ্ছা গোমরাহ কর এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখাও।

যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি জওয়াবে ওযর স্বরূপ বললেন ঃ

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْنِ

অর্থাৎ, আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধের দাবী আছে। তাই আমার আশংকা হয়, তারা আমাকে হত্যা করবে।

এ ধরনের জওয়াব মূসা (আঃ) ছাড়া অন্যের মুখ দিয়ে বের হলে তা বে-আদবী বলে গণ্য হবে। তবে অনুরাগের স্তরে অবস্থানকারীর প্রতি নম্রতা করা হয়। অপরদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) অনুরাগের স্তরে ছিলেন না। তাই তাঁর তরফ থেকে এর চেয়ে কম অভিমানকেও বরদাশত করা হয়নি এবং তাঁকে শাস্তিস্বরূপ মাছের পেটে বন্দী করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্যে এই ঘোষণা হয়ে যায়—

لَوْلَآ أَنْ تَدَارَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ -

অর্থাৎ, যদি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নেয়ামত তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত হয়ে জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্তই হয়েছিল।

হযরত হাসান বলেন ঃ এখানে "জনশূন্য প্রান্তর" হল কিয়ামত। আমাদের রসূলে করীম (সাঃ)-কে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ

অর্থাৎ, অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় এবং মৎস্যওয়ালা ইউনুসের মত অধৈর্য হবেন না। সে বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় ডাক দিয়েছিল।

রিযার স্বরূপ ও ফযীলত ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, রিযা তথা সন্তুষ্টি মহব্বতের অন্যতম ফল এবং নৈকট্যশীলদের একটি উচ্চতম মকাম। এর স্বরূপ অনেকেরই অজানা। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে যথার্থ জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করেছেন, তারাই এর সামঞ্জস্য ও অস্পষ্টতার সমাধান ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। অতএব রিযার স্বরূপ, ফযীলত ও রিযাবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

রিযার ফযীলত সম্পর্কে আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

অর্থাৎ, অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হতে পারে।

চূড়ান্ত অনুগ্রহ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। এটা তখনই হয়, যখন বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ, বসবাসের উদ্যানসমূহে পরিচ্ছন্ন ভবন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক নিজের সন্তুষ্টিকে বসবাসের জান্নাত থেকে বৃহৎ বলেছেন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই জান্নাতবাসীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে— আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মুমিনদের জন্যে জ্যোতি বিকিরণ করবেন এবং বলবেন ঃ আমার কাছে প্রার্থনা কর। মুমিনরা আরয করবে— আমরা তোমার রিযা চাই। দীদারের পর এই রিযা প্রার্থনা করা থেকে রিযার অসাধারণ ফযীলত জানা যায়।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার সন্তুষ্টির অর্থ পরে উল্লিখিত হবে। এখানে বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এর অর্থ বান্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের অর্থের কাছাকাছি, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচিত করা জায়েয নয়। কারণ, এ

বিষয়টি উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ। যে ব্যক্তি এটা অর্জন করতে সক্ষম, তাকে অন্যের বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। সে নিজে নিজেই এর স্বরূপ জেনে নেয়।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার দীদারের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। দীদার লাভের পর জান্নাতীরা যে রিযা প্রার্থনা করেছে, তার কারণ রিযা হল, স্থায়ী দীদারের উপায়। তাই তারা রিযা প্রার্থনা করে যেন এটাই প্রার্থনা করেছে যে, আমাদের দীদার স্থায়ী হোক।

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

অর্থাৎ, আমার কাছে আরও বেশি আছে।

আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির তাফসীর প্রসঙ্গে জনৈক তাফসীরকার লিখেন— জান্নাতীদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনটি উপঢৌকন আসবে। এক, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এমন একটি হাদিয়া, যার তুলনা জান্নাতীদের কাছে থাকবে না। এই হাদিয়ার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে —

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ -

অর্থাৎ, তাদের জন্যে যে কি চোখের শান্তি নিহিত রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না।

দ্বিতীয় উপঢৌকন হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম। এটা হবে প্রথম হাদিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

অর্থাৎ, দয়ালু পালন কর্তার পক্ষ থেকে সালাম বলা হবে। তৃতীয়, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন— আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটা হাদিয়া ও সালাম উভয়টি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ পাক বলেন—

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ।

এ থেকে খোদায়ী সন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। রিযার ফযীলত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদল সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি? তারা আরয করলেন ঃ আমরা ঈমানদার। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের ঈমানের লক্ষণ কি? তারা আরয করলেন ঃ আমরা বালা মুসীবতে সবর করি, স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করি এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। অন্য এক হাদীসে আছে—

طوبى لمن هدى الى الاسلام وكان رزقه كفافا ورضى به

অর্থাৎ, মোবারকবাদ সে ব্যক্তিকে, যাকে ইসলামের পথপ্রদর্শন করা হয়, যার রুযী প্রয়োজন পরিমাণে এবং সে তাতে রাযী।

আরও এরশাদ হয়েছে—

من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل -

অর্থাৎ, যে অল্প রিযিকে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ অল্প আমলে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

আরও বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের একদল লোকের প্রতি কৃপা করবেন। তারা তাদের কবর থেকে উড়ে জান্নাতের দিকে যাবে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেখানে আনন্দ-উল্লাস করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে— তোমরা কি পুলসিরাত পার হয়ে এসেছ? তারা জওয়াব দেবে— আমরা তো পুলসিরাত দেখিনি। আবার প্রশ্ন করা হবে— তোমরা কি দোযখ দেখেছ? তারা বলবে, আমরা তো কিছুই দেখিনি। ফেরেশতারা বলবে— তাহলে তোমরা কোন্ পয়গাম্বরের উম্মত? তারা বলবে— আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত। তারা শুধাবে, আমরা কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্য বল দুনিয়াতে তোমাদের আমল কি ছিল? তারা জওয়াব দিবে— দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে দুটি

চরিত্র বিদ্যমান ছিল, যে কারণে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় আমরা এ মর্তবায় পৌঁছেছি। প্রথম, আমরা যখন একাকী থাকতাম, তখন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করতে লজ্জাবোধ করতাম। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে যা নির্দিষ্ট করতেন, তাতেই আমরা রাযী থাকতাম। ফেরেশতারা বলবে, তাহলে তো তোমাদের এ অবস্থা হওয়াই উচিত। অন্য এক হাদীসে আছে—

يامعشر الفقراء اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروابثواب فقركم وا لا فلا -

অর্থাৎ, হে দরিদ্র শ্রেণী, তোমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্টি নিবেদন কর। তা হলে দারিদ্র্যের সওয়াব লাভে সফল হবে। অন্যথায় নয়।

একবার বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের জন্যে এমন কোন কাজের কথা জিজ্ঞেস করুন, যা করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী, তারা যা বলে তা আপনি শুনেছেন। আদেশ হল ঃ হে মূসা, তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, যাতে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এরশাদ করেন—

من احب ان يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر ماالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث انزله العبد من نفسه -

অর্থাৎ, সে পছন্দ করে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার যা আছে, তা জেনে নেবে, সে যেন দেখে, তার কাছে আল্লাহ তা'আলার জন্যে কি আছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নিজের কাছে সে স্তরে রাখেন, যে স্তরে বান্দা নিজের কাছে আল্লাহ তা'আলাকে রাখে।

হযরত মূসা (আঃ) তার মোনাজাতে আরয করলেন ঃ ইলাহী! তোমার

সৃষ্টির মধ্যে কে তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? এরশাদ হল— যার কাছ থেকে আমি তার প্রিয়বস্তু নিয়ে নিলে সে আমার সাথে অনরঙ্গ সম্বন্ধ রাখে। মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ সে ব্যক্তি কে, যার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হও? এরশাদ হল— যে কোন কাজে আমার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে, এরপর যখন আমি আদেশ দিয়ে দেই, তখন সে নাখোশ হয়। অন্য এক রেওয়ায়েত আরও কঠোর। আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমাকে ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যে ব্যক্তি আমার দেয়া মুসীবতে সবর করে না, আমার নেয়ামতের শোকর করে না এবং আমার ফয়সালায় রাযী থাকে না, তার উচিত আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নেয়া। এরই অনুরূপ একটি হাদীসে কুদসী রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি তাকদীর নির্ধারণ করেছি এবং কাজকর্ম সংহত করেছি। এখন যে রাযী হবে, তার প্রতি আমি রাযী আমার সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত, আর যে নাখোশ হবে, তার জন্যে আমার অসন্তুষ্টি আমার কাছে আসা পর্যন্ত। অন্য এক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ রয়েছে— আমি ভাল-মন্দ উভয়টি সৃষ্টি করেছি। এখন সে ব্যক্তি ভাল, যাকে আমি কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করি। আর সে ব্যক্তি মন্দ, যাকে আমি অমঙ্গলের জন্যে সৃষ্টি করেছি এবং অমঙ্গলের পথে চালনা করি। সে ব্যক্তির জন্যে ধ্বংসই ধ্বংস, যে বিতর্ক ও প্রশ্ন করে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন— হে দাউদ, তুমি বাসনা কর, আমিও বাসনা করি; কিন্তু হবে তাই, যা আমি বাসনা করি। যদি তুমি আমার বাসনায় রাযী থাক, তবে তোমার বাসনার জন্যে আমি যথেষ্ট হব। পক্ষান্তরে যদি তুমি আমার বাসনা অমান্য কর, তবে তোমার বাসনায় আমি তোমাকে পরিশ্রমে ফেলে দেব, এরপর হবে তাই, যা আমি চাইব।

মনীষীদের উক্তিসমূহেও রিযার অনেক ফযীলত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সর্বপ্রথম যাদেরকে জান্নাতে ডাকা হবে, তারা হবে এমন লোক, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় রাযী থাকে।

মায়মূন ইবনে মহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী হয় না, তার নির্বুদ্ধিতার কোন প্রতিকার নেই। আবদুল আযীয ইবনে আবু রোয়াদ (রঃ) বলেন ঃ সিরকা দিয়ে যবের রুটি খাওয়া ও পশমী

পোশাক পরার মধ্যে জাঁকজমক নেই; বরং জাঁকজমক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকার মধ্যে।

এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের পায়ে যখম দেখে বলল ঃ এই যখমের কারণে আপনার প্রতি আমার করুণা হয়। তিনি বললেন ঃ এই যখম হওয়ার পর থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার শোকর করছি যে, এটা আমার চোখে হয়নি।

বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে বর্ণিত আছে— জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার এবাদত করে। তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, অমুক মহিলা— যে ছাগল চরায়, সে জান্নাতে তোমার সঙ্গিনী হবে। আবেদ পর দিন সেই মহিলার খোঁজে বের হল এবং লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সন্ধান পেল। সে মহিলার আমল দেখার উদ্দেশ্যে তিন দিন তার বাড়িতে অবস্থান করল। এ সময় আবেদ নিজে সারারাত দাঁড়িয়ে এবাদত করত; কিন্তু মহিলা আরামে ঘুমিয়ে থাকত। দিনের বেলায় আবেদ রোযা রাখত, আর মহিলা পানাহার করত। একদিন আবেদ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার এ ছাড়া আরও কোন আমল আছে কি? মহিলা বলল ঃ আর কিছু নেই। আপনি যা দেখেছেন, তাই। আমি নিজের মধ্যে অন্য কোন আমল জানি না। আবেদ বলল ঃ ভাল করে স্মরণ করে বল আরও কোন আমল আছে কিনা? হাঁ আমার মধ্যে আর একটি ছোট-খাটো অভ্যাস আছে। তা এই যে, আমি সংকটে পড়ে কোন সময় বাসনা করি না যে, আমার অবস্থা আরও ভাল হোক। রুগ্ন হয়ে আশা করি না যে, সুস্বাস্থ্য ফিরে আসুক। যদি রৌদ্রে থাকি, তবে ছায়ার প্রত্যাশী হই না। এ কথা শুনে আবেদ নিজের মাথায় হাত রেখে বলল ঃ এটা ছোটখাটো অভ্যাস নয়; বরং এতই বড়, যা অর্জন করতে আবেদ অক্ষম।

জা'ফর ইবনে সোলায়মান হযরত রাবেয়া বসরীকে প্রশ্ন করলেন ঃ বান্দা আল্লাহর প্রতি রাযী— একথা কখন বলা যায়? তিনি বললেন ঃ যখন বিপদেও ততখানি খুশী হয়, যতখানি নেয়ামত পেয়ে হয়।

হযরত ফুযায়ল বলতেন— আল্লাহ তা'আলার দেয়া না দেয়া উভয়ই যখন বান্দার কাছে সমান হয়ে যায়, তখন সে আল্লাহর প্রতি রাযী হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া রিযার পরিপন্থী নয় ঃ যে দোয়া করে, দোয়ার কারণে সে রিযার মকাম থেকে খারিজ হয় না। এমনিভাবে

গোনাহকে খারাপ মনে করা, অপরাধীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া, গোনাহের কারণসমূহকে ঘৃণা করা এবং সেগুলো দূর করার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্য পালন করাও রিযার পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে কিছু লোকের বিভ্রান্তি হয়েছে। তারা বলে, গোনাহ, নির্লজ্জ কাজ ও কুফর আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা তাকদীর বৈ নয়। অতএব, এগুলোতেও রিযা ও সন্তুষ্টি দরকার। এসব লোক শরীয়তের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। দোয়াকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এবাদতই সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের অধিক পরিমাণে দোয়া করা এ বিষয়ের প্রমাণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিযার উচ্চতম মকামে ছিলেন। দোয়া রিযার পরিপন্থী হলে তিনি অধিক পরিমাণে দোয়া কেন করতেন? আল্লাহ পাক কোন কোন বান্দার প্রশংসায় বলেন ঃ

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا -

অর্থাৎ, আগ্রহ ও ভয় সহকারে তারা আমার কাছে দোয়া করে।
গোনাহকে অপছন্দ করা, তাকে খারাপ মনে করা এবং তাতে রাযী না হওয়াকেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি গোনাহে সন্তুষ্ট থাকার নিন্দা করেছেন। বলা হয়েছে—

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রশান্ত ।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ, তারা পেছনে অবস্থানকারিণী মহিলাদের সাথে থাকতে রাযী হয়েছে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।

এক মশহুর হাদীসে আছে—

من شهد منكرافرضى به كانه قد فعله -

অর্থাৎ, যে কোন অসৎকাজে উপস্থিত থাকে, অতঃপর তাতে রাযী থাকে, সে যেন নিজেই সে অসৎ কাজ করে।

অন্য এক হাদীসে আছে—

الدال على الشركفاعله

অর্থাৎ, যে মন্দ কাজের পথ দেখিয়ে দেয়, সে সে ব্যক্তির মত, যে নিজে সেটা করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ মন্দ কাজ থেকে অনুপস্থিত ও দূরে থাকে। এরপরও তার ততটুকুই গোনাহ হয়, যতটুকু যে মন্দ কাজ করে, তার হয়। শ্রোতারা আরয করল ঃ এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ এটা এভাবে যে, সে যখন সে মন্দ কাজের সংবাদ পায়, তখন তাতে রাযী থাকে। এক হাদীসে আছে— যদি এক ব্যক্তি প্রাচ্যে নিহত হয় এবং অপর ব্যক্তি পাশ্চাত্যে বসে সেই হত্যাকাণ্ডে রাযী থাকে, তবে সেও এই হত্যাকাণ্ডে অংশীদার হবে।

কাফের ও পাপাচারীদের সাথে শত্রুতা রাখা ও তাদের অস্বীকার করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, মুমিনরা মুমিনদের ছাড়া কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ -

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا -

অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি কিছু কিছু পাপাচারীকে কিছু কিছু পাপাচারীর সাথে মিলিয়ে দেই।

হাদীস শরীফে আছে— আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনের কাছ থেকে প্রত্যেক মুনাফিকের সাথে শত্রুতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রত্যেক মুনাফিকের কাছ থেকে মুমিনের সাথে শত্রুতা পোষণের অঙ্গীকার নিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন—

من احب قوما ووالاهم حشر معهم يوم القيامة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথেই উত্থিত করা হবে।

এখানে প্রশ্ন হয়, কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকতে হবে। পাপ ও গোনাহ আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া হয় না। অতএব, পাপকে খারাপ মনে করা আল্লাহর ফয়সালাকে খারাপ মনে করা নয় কি? এই পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা কি? একই বস্তুর মধ্যে রিযা ও ঘৃণা কেমন করে একত্রিত হতে পারে? জওয়াব এই যে, যাদের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তারা অসৎকাজে চুপ থাকাকে রিযা মনে করেছে এবং এর নাম রেখেছে সচ্চরিত্রতা। অথচ এটা নিছক মূর্খতা। আসলে রিযা ও ঘৃণা যখন একই বস্তুতে একই দিক দিয়ে এবং একইভাবে হয়, তখন অবশ্য একটি অপরটির বিপরীত হয়। কিন্তু যদি এক বস্তুতে এক দিক দিয়ে রিযা এবং অন্য দিক দিয়ে ঘৃণা হয়, তবে নিশ্চিতই একটি অপরটির বিপরীত হবে না এবং তা সম্ভব। উদাহরণতঃ তোমার কোন শত্রু মারা গেল। সে ছিল তোমার অন্য এক শত্রুরও শত্রু এবং সে তোমার সেই শত্রুকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকত। বলা বাহুল্য, এমন শত্রুর মৃত্যু তোমার কাছে এ দিক দিয়ে খারাপ লাগবে যে, সে তোমার শত্রু নিধনে সচেষ্ট থাকত। আর এ দিক দিয়ে ভাল মনে হবে যে, তোমার এক শত্রু খতম হয়ে গেছে। এখানে একই শত্রুর মৃত্যু একদিক দিয়ে খারাপ হয় এবং অন্যদিক দিয়ে ভাল হল। এখানে মোটেই পরস্পর বিরোধিতা নেই।

এমনিভাবে গোনাহেরও দুটি দিক আছে। একদিক এই যে, গোনাহ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় ও ইচ্ছায় হয়। এদিক দিয়ে এতে রিযা থাকা দরকার যে, যার বস্তু, তিনি তাতে যা ইচ্ছা তাই করবেন। অপরদিক এই যে, গোনাহ বান্দার "কসব" তথা উপার্জন দ্বারা অর্জিত হয় এবং তার বিশেষণ হয়। এটা আল্লাহর কাছে "মগযুব" তথা গযবে পতিত হওয়ার কারণ। এই দৃষ্টিকোণে গোনাহ মন্দ ও নিন্দনীয়; সুতরাং ঘৃণার যোগ্য।

এ থেকে জানা গেল যে, গোনাহ থেকে বাঁচা এবং গোনাহ ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাযী থাকার পরিপন্থী নয়।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা দোয়াকে বান্দার জন্যে এবাদত হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে দোয়ার কারণে অন্তরে অসহায়ত্ব, নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়। তবে অভিযোগের ভঙ্গিতে বিপদ প্রকাশ করা এবং অন্তরে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্দ জানা রিযার পরিপন্থী।

গোনাহের কেন্দ্র থেকে পলায়ন ঃ স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহামারীগ্রস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা যায়, যে এলাকায় গোনাহ প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখান থেকেও পলায়ন না করা উচিত। কেননা, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন হবে। এরূপ মনে করা ঠিক নয়। বরং মহামারী প্রকাশ হয়ে পড়লে পলায়ন নিষিদ্ধ করার কারণ এই যে, এর অনুমতি দেয়া হলে সুস্থ লোকজন সকলেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাবে এবং কেবল রোগাক্রান্তরা থেকে যাবে। ফলে, কোন সেবা-শুশ্রূষাকারী না থাকার কারণে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের কারণে হত, তবে যে ব্যক্তি মহীমারীগ্রস্ত এলাকার কাছে পৌছে যায়, তাকে সেখান থেকে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হতো না। কেননা, এটাও আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়নের শামিল।

নিষেধাজ্ঞার উপরোক্ত কারণ জানার পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে এলাকায় গোনাহ প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখান থেকে পলায়ন করা আল্লাহর ফয়সালা থেকে পলায়ন করার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে গোনাহে উত্তেজিত করে এমন জায়গার নিন্দা বর্ণনা করা মানুষকে দূরে রাখার জন্যে নিন্দনীয় নয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রায়ই এরূপ স্থান বিশেষের নিন্দা করেছেন। এমনী একদল বুযুর্গ বাগদাদ শহরের নিন্দায় মুখর ছিলেন। তারা যথাসম্ভব এই শহর থেকে পলায়নের চেষ্টা করতেন। হযরত ইবনে মোবারক (রঃ) বলতেন ঃ আমি পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশ ঘুরেছি; কিন্তু বাগদাদের মত মন্দ শহর কোথাও দেখিনি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ সে শহরটি কেমন? তিনি বললেন ঃ এই শহরে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁর প্রতি নাফরমানীকে তুচ্ছ বিষয় গণ্য করা হয়। তিনি যখন খোরাসানে পৌছেন, তখন লোকেরা তাঁকে বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমি এতে কেবল তিন প্রকার লোক

দেখেছি— ক্রুদ্ধ সিপাহী, বেদনাক্লিষ্ট বণিক ও বিস্ময়াবিষ্ট আলেম। তাঁর এই উক্তি কোন গীবত ছিল না। কেননা, তিনি এতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম উচ্চারণ করেননি এবং কোন বাগদাদীকে লক্ষ্যে পরিণত করেননি; বরং এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সতর্ক করা। মক্কা যাওয়ার পথে তিনি বাগদাদে ষোল দিনের বেশী অবস্থান করতেন না। এ সময়ের মধ্যে তাঁর কাফেলা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে যেত। তিনি এই ষোল দিনের বিনিময়ে ষোল দীনার সদকা করে দিতেন। কোন কোন বুযুর্গ ইরাককে মন্দ বলতেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) এ দলভুক্ত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর এক গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুই কোথায় থাকিস? সে বলল ঃ ইরাকে। তিনি বললেন ঃ সেখানে তোর কাজ কি? আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ইরাকে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার পেছনে কোন বালা লাগিয়ে দেন। হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) একদিন ইরাকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ এর দশ ভাগের নয় ভাগে পাপাচার রয়েছে, যার কোন প্রতিকার নেই। জনৈক বুযুর্গ আরও বললেন ঃ কল্যাণকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর নয় ভাগ সিরিয়ায় এবং এক ভাগ ইরাকে স্থান পেয়েছে। আর অনিষ্টের দশ ভাগের নয় ভাগ ইরাকে এবং একভাগ সিরিয়ায় স্থান পেয়েছে।

জনৈক মুহাদ্দিস বলেন ঃ আমি একদিন হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়াযের খেদমতে ছিলাম। এমন সময় জনৈক সুফী সম্মুখে এল। তিনি তাকে নিজের সাথে বসিয়ে বললেন ঃ তোমার বাড়ি কোথায়? সুফী বলল ঃ বাগদাদে। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কাছে মানুষ দরবেশের ন্যায় পোশাক পরিধান করে আসে; কিন্তু যখন কোথায় থাক জিজ্ঞেস করা হয়, তখন বলে ঃ যালেমদের বাসায় থাকি। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ যদি এই সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক আমার সাথে না থাকত, তবে আমি এ শহরে থাকতাম না। লোকেরা প্রশ্ন করল, তাহলে কোথায় থাকতেন? তিনি বললেন ঃ পাহাড়ের উপত্যকায়। এক বুযুর্গকে বাগদাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সেখানকার দরবেশ পাক্কা দরবেশ আর সেখানকার দুষ্ট পাক্কা দুষ্ট।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, যে শহরে গোনাহের আধিক্য ও পুণ্যের স্বল্পতা বিরাজমান, যেখানে কেউ আটকা পড়লে তার উচিত হিজরত করা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا -

অর্থাৎ, হিজরত করার জন্যে আল্লাহর ভূ-পৃষ্ঠ কি সুবিস্তৃত ছিল না?

যদি পরিবার-পরিজনের বাধার কারণে কেউ হিজরত করতে সক্ষম না হয়, তবে বিষণ্ন মনেই থাকা উচিত এবং সর্বদা দোয়া করা উচিত—

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

অর্থাৎ, ইলাহী! যালেম অধিবাসীদের এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নাও।

এর কারণ এই যে, যেখানে পাপাচারীদের আধিক্য হয়ে যায়, সেখানে ব্যাপক বিপদ আসে, যা ভাল-মন্দ সকলকেই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দারাও রেহাই পায় না।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً -

অর্থাৎ, তোমরা এমন ফেতনা থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম তাদেরকেই বিপর্যস্ত করবে না।

মোটকথা, পাপকাজে রিযা সর্বাবস্থায় নয়; বরং শুধু এ দিক দিয়ে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। নতুবা স্বয়ং পাপকাজে রাযী থাকার কোন কারণ নেই।

তিন ব্যক্তি তিন স্থানে অবস্থান করে। তাদের একজন দীদারের আগ্রহে মৃত্যুকে পছন্দ করে। দ্বিতীয়জন মাওলার খেদমতের জন্যে জীবিত থাকাকে ভাল মনে করে। তৃতীয়জন বলে ঃ আমি কেবল তাই পছন্দ করি, যা আল্লাহ আমার জন্যে পছন্দ করেন— তা মৃত্যু হোক অথবা জীবন। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কে উত্তম, এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। জনৈক ওলী-আল্লাহকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ রিযা বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তম। কেননা, তাদের মধ্যে তার ঝামেলাই সবচেয়ে কম।

একদিন ওয়াহাব ইবনে ওয়ার্দ, সুফিয়ান ছওরী ও ইউসুফ ইবনে বিসাত এক জায়গায় সমবেত হলেন। হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ অদ্যকার পূর্বে আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে খুব খারাপ মনে হত; কিন্তু আজ আমি মরে যেতে চাই। ইউসুফ ইবনে বিসাত কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কারণ, আমি ফেতনাকে ভয় করি। ইউসুফ ইবনে বিসাত বললেন ঃ আমার কাছে দীর্ঘায়ু হওয়া খারাপ মনে হয় না। আমি আশা করি, সম্ভবত এমন কোন দিন পাওয়া যাবে, যাতে তওবা নসীব হয়ে যাবে এবং কোন নেক আমল করতে পারব। অতঃপর তাঁরা হযরত ওয়াহাবকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিছুই পছন্দ করি না। যা কিছু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রিয়, তাই আমার প্রিয়— তিনি জীবিত রাখুন অথবা ওফাত দান করুন। হযরত সুফিয়ান ছওরী উঠে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক।

আশেকগণের কাহিনী ঃ জনৈক আরেফ (আল্লাহভক্ত লোক) বলতেন ঃ যখন তুমি আমাকে দেখে ফেলেছ, তখন তা চল্লিশ জনকে দেখার সমান হয়ে গেছে। কেননা, আমি চল্লিশ জন আবদালকে দেখেছি এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা না একটা চরিত্র আহরণ করেছি। এই বুযুর্গকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ আমরা শুনেছি, আপনি খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি হেসে বললেন ঃ যে খিযিরকে দেখে, তার কোন কৃতিত্ব নেই; বরং কৃতিত্ব সেই ব্যক্তির, যাকে খিযির দেখতে চায় কিন্তু সে আত্মগোপন করে।

হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ)-এর খেদমতে একবার আরয করা হল ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলাকে যে প্রত্যক্ষ করেন তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি সজোরে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ এটা জানা তোমাদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লোকেরা আরয করল ঃ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে আপনি নিজের নফসের বিরুদ্ধে যে কঠোরতর মোযাজাদা করেছেন, তা আমাদেরকে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে ওয়াকিফ্হাল করাও বৈধ নয়। তারা আরয করল ঃ তা হলে সাধনার শুরুতে আপনি যা যা করতেন, তাই বলুন। তিনি বললেন ঃ প্রথমে আমি আমার নফ্সকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবান করলাম। সে অবাধ্যতা করল। আমি তাকে কসম দিলাম যে, এক বছর পানি পান করব না এবং নিদ্রার স্বাদ আস্বাদন করব না। অতঃপর নফ্স তা পূর্ণ করেছে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বর্ণনা করেন— আমি আবু ইয়াযীদকে এশার নামাযের পর সোবহে সাদেক পর্যন্ত এভাবে বসে থাকতে দেখেছি, হাঁটু মাটিতে রাখা, আবার উপরে পায়ের পাতা ও গোড়ালি মাটি থেকে উত্তোলিত। চিবুক বুকের সাথে সংযুক্ত এবং উভয় চক্ষু অনিমেষ উন্মীলিত। যখন সকাল নিকটবর্তী হল, তখন তিনি একটি সেজদা করে আবার বসলেন এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! কিছু লোক তোমার কাছে প্রার্থনা করেছে এবং তুমি তাদেরকে পানিতে ও বায়ুতে চলার ক্ষমতা দান করেছ। তারা এতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। আমি তোমার কাছে এসব বিষয় থেকে আশ্রয় চাই। আরও কিছু লোক তোমার কাছে আবেদন করেছে। তুমি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা দান করেছ। তারা এতেই রাযী হয়েছে। আমি এ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার কাছে সওয়াল করলে তুমি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠের ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দিয়েছ। তারা এ নিয়েই খুশী হয়েছে। কিন্তু আমি তোমার কাছে এ থেকেও আশ্রয় চাই। এভাবে তিনি ওলীগণের বিশটিরও বেশী কারামতের কথা দোয়ার ভেতরে উল্লেখ করলেন। এরপর চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতেই দেখলেন, ইয়াহইয়া দণ্ডায়মান। আমি আরয করলাম ঃ খাদেম হাযির। তিনি বললেন ঃ তুমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে? আমি আরয করলাম ঃ অনেকক্ষণ ধরে। অতঃপর তিনি চুপ করে রইলেন। আমি আরয করলাম ঃ আমাকে আপনার কিছু হাল বলুন। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্যে যা উপযুক্ত তাই বলছি শুন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিম্নের আকাশে দাখিল করলেন এবং নিম্নজগত ভ্রমণ করালেন। জান্নাত থেকে আরশ পর্যন্ত যা কিছু আকাশসমূহে ছিল, সবই আমাকে দেখিয়েছেন। এরপর আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন ঃ তুমি যা যা দেখছ, এগুলোর মধ্যে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিয়ে দেব। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ, আমি এমন কোন বস্তু দেখিনি, যা ভাল মনে করে তোমার কাছে চাইতে পারি। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি আমার সাচ্চা বান্দা। তুমি ঠিক আমারই জন্যে আমার এবাদত কর। এছাড়া আরও অনেক কথা বললেন। ইয়াহইয়া ইবনে মোয়ায বলেন ঃ একথা শুনে আমি ভীত হয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মারেফত প্রার্থনা করলেন না কেন? আপনাকে তো এই শাহানশাহের পক্ষ থেকে বলাই হয়েছিল, যা চাইবে, তা-ই পাবে। হযরত আবু ইয়াযীদ একটি চিৎকার দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ চুপ কর। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়ে গেল, আমাকে ছাড়া কেউ যেন তাঁকে না চিনে! তাঁর মারেফত অন্যরা পাবে, এটা আমার কাছে ভাল মনে হয়নি।

বর্ণিত আছে, আবু তোরাব বখশী (রহঃ) জনৈক মুরীদকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাকে কাছে জায়গা দিতেন এবং তার খেদমত করতেন। মুরীদ এবাদতে মশগুল থাকত। একদিন আবু তোরাব তাকে বললেন ঃ আবু ইয়াযীদ বোস্তামীর সংসর্গ অবলম্বন কর। মুরীদ বলল ঃ আমার তার প্রয়োজন নেই। আবু তোরাব অধিক পীড়াপীড়ি করলে মুরীদ জোশের মুখে বলে ফেলল ঃ আমি আবু ইয়াযীদকে দিয়ে কি করব? আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি। তিনি আমাকে আবু ইয়াযীদকে দেখার মুখাপেক্ষী রাখেননি। আবু তোরাব বলেন ঃ এ কথা শুনে আমারও মন বিগড়ে গেল। আমি বেসামাল হয়ে বলে উঠলাম ঃ আল্লাহকে দেখে অহংকারী হয়ে যাও? যদি আবু ইয়াযীদকে একবার দেখ, তবে আল্লাহ তা'আলাকে সত্তর বার দেখার চেয়ে অধিক উপকারী হবে। মুরীদ অত্যন্ত হয়রান হয়ে বলল ঃ তা কেমন করে হতে পারে? আবু তোরাব বললেন— তুমি আল্লাহ তা'আলাকে নিজের কাছে দেখলে তিনি তোমার সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করেন, আর আবু ইয়াযীদকে আল্লাহ তা'আলার কাছে দেখলে আল্লাহ তা'আলা আবু ইয়াযীদের সহনশক্তির পরিমাণ অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করবেন। মুরীদ একথার তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর বলল ঃ আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। আবু তোরাব বলেন ঃ আমরা গিয়ে একটি টিলার উপর দাঁড়ালাম এই অপেক্ষায় যে, আবু ইয়াযীদ জঙ্গল থেকে বের হবেন। কেননা, তিনি তখন হিংস্র প্রাণীদের জঙ্গলে বসবাস করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু ইয়াযীদ একটি পালকযুক্ত পরিধেয় কোমরে বেঁধে বের হলেন। আমি মুরীদকে বললাম ঃ ইনি আবু ইয়াযীদ। তাঁকে দেখা মাত্রই সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আমরা তাকে নাড়া দিয়ে মৃত পেলাম। আমরা সকলে মিলে তাকে দাফন করলাম। আমি আবু ইয়াযীদের খেদমতে আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনার দিকে দেখার কারণে লোকটি মরে গেল। তিনি বললেন ঃ তা নয়; বরং তোমার মুরীদ ছিল সাচ্চা। তার অন্তরে একটি রহস্য লুকিয়ে ছিল। আমাকে দেখা মাত্রই তার মনের সব রহস্য খুলে গেল। দুর্বল মুরীদের মকামে ছিল বলে সে তা সহ্য করতে পারল না। মারা গেল।

যখন হাবশী সৈন্যরা বসরায় প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে, তখন হযরত সহলের মুরীদরা তাঁর কাছে সমবেত হয়ে আরয করে, আপনি এদেরকে হটিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। হযরত সহল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বললেন ঃ এ শহরে আল্লাহ তা'আলার কিছু বান্দা আছেন, যারা যালেমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলে সকাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কোন যালেমের অস্তিত্ব থাকবে না। একই রাত্রিতে সব খতম হয়ে যাবে। কিন্তু তারা বদদোয়া করেন না। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করল ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ কারণ, যে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা ভাল মনে করেন না, সেটা তাদের কাছেও ভাল লাগে না।

হযরত বিশর (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এই মর্তবায় কেমন করে পৌছলেন? তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করতাম যাতে তিনি আমার অবস্থা গোপন রাখেন এবং কারও কাছে প্রকাশ না করেন। বর্ণিত আছে, তিনি হযরত খিযির (আঃ)-কে দেখেছেন এবং তাঁকে বলেছেন— আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। খিযির (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের আনুগত্য তোমার জন্যে সহজ করুন। তিনি বললেন ঃ আরও কিছু দোয়া করুন। খিযির (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আনুগত্যকে মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখুন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ হযরত খিযিরকে দেখার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এজন্যে আমি একবার আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলাম। আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর সাক্ষাত আমার নসীব হল। আমি তখন অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে কেবল একথাই বললাম ঃ হে আবুল আব্বাস! আপনি আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন, যা পাঠ করলে আমি মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে যাই। তাদের অন্তরে আমার কোন মান না থাকে এবং আমার ধর্মপরায়ণতা কেউ জানতে না পারে। তিনি বললেন ঃ এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اسْبِلْ عَلٰى كَثِيْفِ سِتْرِكَ وَحُطَّ عَلٰى سُرَادِقَاتِ حُجُبِكَ
وَاجْعَلْنِىْ فِىْ مَكْنُوْنِ عَيْبِكَ وَاحْجُبْنِىْ مِنْ قُلُوْبِ خَلْقِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমার উপর তোমার পুরু পর্দা ফেলে দাও। আমার উপর তোমার যবনিকা নামিয়ে দাও। আমাকে রাখ গোপন দোষের মধ্যে এবং আমাকে মানুষের অন্তর থেকে লুকিয়ে রাখ।

এরপর হযরত খিযির (আঃ) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে পুনরায়

কখনও দেখিনি এবং মনে দেখার আগ্রহও সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাঁর শিখানো দোয়া সর্বদা পাঠ করতে থাকলাম।

তাঁরই বর্ণনা অনুযায়ী এই দোয়ার প্রভাব এমনভাবে প্রতিফলিত হল যে, মানুষের মধ্যে তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা ও মূল্যহীনতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। যিম্মী তথা অমুসলিম আশ্রিতরাও তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং ধরে নিয়ে বিনা মজুরীতে নিজেদের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিত। তিনি এসব আচরণ নীরবে সহ্য করতেন। মোটকথা, তাঁর অন্তরে সুখ ও সংশোধন লাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত থাকার মধ্যে নিহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার ওলীদের এই ছিল অবস্থা। তাদেরকে অজ্ঞাতদের মধ্যেই খোঁজ করা উচিত। কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ তাদেরকে এমন লোকদের মধ্যে তালাশ করে, যারা পরিধান করে নানা রকম কাপড়ে তালি দেওয়া পোশাক, কিন্তু জ্ঞান-গরিমা, পরহেযগারী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীগণকে গোপন রাখাই পছন্দ করেন। হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছে— আমার আওলিয়া আমার কা'বার নীচে থাকে। আমাকে ছাড়া কেউ তাদেরকে চিনে না।

সারকথা, যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা করে, তাদের অন্তর ওলীত্বের সুগন্ধি থেকে অধিকতর দূরে থাকে। আর অধিকতর নিকটবর্তী তাদের অন্তর, যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও বুঝে না যে, অপমান ও লাঞ্ছনা কি? যেমন, গোলাম অপমান বুঝে না যখন তার প্রভু তার উপরের আসনে বসে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাদের অন্তর এমন না থাকে এবং আমরা এমন আত্মা থেকে যদি বঞ্চিত হই, তবে যারা এর যোগ্য, এসব কারামতের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস না রাখা আমাদের উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ওলী হওয়া যদি কারো পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে অন্তত ওলীদের প্রতি মহব্বত ও ঈমান রাখা তো তার জন্যে সম্ভব। হয়তো বা এর দৌলতেই কিয়ামতের দিন ওলীদের সাথে তার হাশর হয়ে যাবে। প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে— المرء مع من احب —মানুষ তার সাথেই থাকবে, যাকে সে মহব্বত করে। অনুনয় ও বিনয় অধিকতর উপকারী। তার প্রমাণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি। তিনি বনী ইসরাঈলকে প্রশ্ন করেন ঃ শস্যকণা কোথায় গজায়? তারা আরয করল ঃ মাটিতে। তিনি বললেন ঃ আমি সত্য বলছি, হেকমত ও প্রজ্ঞাও সে অন্তরেই গজিয়ে উঠে, যা মাটির মত হয়।

আল্লাহ তা'আলার ওলীত্ব অন্বেষণকারী বুযুর্গগণ নিজের নফসকে লাঞ্ছনার চরম পর্যায়ে পৌছিয়েই এই মর্তবা লাভ করেছেন। বর্ণিত আছে, হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর ওস্তাদ ইবনে করবনীকে এক ব্যক্তি ভোজের দাওয়াত দিল। তিনি তার ঘরের দরজায় পৌছলে তাঁকে তাড়িয়ে দিল। কিছুদূর চলে গেলে লোকটি তাঁকে আবার ডাকল। তিনি এলে আবার তাঁকে তাড়িয়ে দেয়া হল। এভাবে তিনবার ডাকল এবং তাড়িয়ে দিল। চতুর্থবার ডাকার পর যখন তিনি এলেন, তখন তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ মাফ করবেন, আমি আপনার বিনয় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আপনাকে বারবার তাড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি আমার নফ্সকে বিশ বছর ধরে লাঞ্ছনায় অভ্যস্ত করেছি। ফলে, সে এখন কুকুরের মত হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দিলে চলে যায়। আবার একটি হাড্ডি ফেলে দিলে চলে আসে।

যদি তুমি আমাকে পঞ্চাশ বারও তাড়িয়ে দিতে এবং ডাকতে, তবে আমি চলে আসতাম। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ইবনে করবনীই বলেন ঃ আমি এক মহল্লায় বাস করতাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সাধুতায় খ্যাত হয়ে গেলাম। এতে আমার মন অশান্ত হয়ে উঠল। এক দিন আমি এক হাম্মামে (গোসলখানায়) গেলে সেখান থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তির মূল্যবান কাপড় নিয়ে এলাম। অতঃপর সে দামী কাপড় পরে তার উপর আমার তালিযুক্ত নানা রঙের ছেঁড়া কাপড় পরে নিলাম। রাস্তায় বের হতেই লোকেরা আমাকে পাকড়াও করল এবং আমার ছেঁড়াবস্ত্র খুলে সেই দামী পোশাক নিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, তারা আমাকে প্রচুর কিলঘুষিও মারল। এরপর থেকে আমি হাম্মাম চোর বলে খ্যাত হয়ে গেলাম এবং আমার অশান্ত মনে শান্তি ফিরে এল।

এখন চিন্তা করা উচিত, বুযুর্গগণ কেমন সাধনার স্তর অতিক্রম করতেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মনোযোগ মানুষের দিক থেকে এমনকি, নিজের সত্তার দিক থেকেও ফিরিয়ে নেন। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সের দিকে লক্ষ্য রাখে, সে আল্লাহ তা'আলা থেকে আড়ালে থাকে এবং নফ্সের দিকে এই দৃষ্টিই তার জন্যে পর্দা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক পর্দা হচ্ছে নিজের নফ্সকে নিয়ে মশগুল থাকা। সেমতে বর্ণিত আছে, বুস্তামের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামীর মজলিসে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকত। একদিন সে আরয করল ঃ

আমি ত্রিশ বছর ধরে অবিরাম রোযা রাখছি এবং রাত জেগে নফল এবাদত করছি। কিন্তু এত সাধনা সত্ত্বেও আপনি যে জ্ঞান বর্ণনা করেন, তা নিজের অন্তরে বিদ্যমান পাই না। অথচ আমি এই জ্ঞানকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং ভালবাসি। হযরত আবু ইয়াযীদ বললেন ঃ ত্রিশ বছর কেন, যদি তুমি তিনশ' বছরও রোযা রাখ এবং রাত্রি জাগরণ কর, তবু এই জ্ঞানের কণা পরিমাণও পাবে না। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ কারণ এই যে, তুমি নিজের নফসের কারণে আল্লাহ তা'আলা থেকে আড়ালে আছ। লোকটি আরয করল ঃ তাহলে এর প্রতিকার কি? তিনি বললেন ঃ প্রতিকার আছে; কিন্তু তুমি তা কবুল করবে না। সে বলল ঃ আপনি বলুন, যাতে আমি তা পালন করতে পারি। তিনি বললেন ঃ এখনি নাপিতের কাছে গিয়ে মাথা ও দাড়ি মুণ্ডন কর। এই পোশাক খুলে কম্বলের লুঙ্গি পরিধান কর। ঘাড়ে আখরুটের একটি ঝুলি তুলে নাও। রাস্তায় গিয়ে নিজের চারপাশে লোকজনকে জড়ো কর। এরপর তাদেরকে বল ঃ যে কেউ আমাকে একটি থাপ্পড় মারবে, আমি তাকে একটি আখরুট দেব। এমনিভাবে প্রত্যেক বাজারে যাও এবং যারা তোমার পরিচিত, তাদের কাছেও যাও এবং থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে আখরুট বিলি কর। লোকটি বলল ঃ সোবহানাল্লাহ, আপনি আমাকে এমন কথা বললেন! তিনি বললেন ঃ তোমার "সোবহানাল্লাহ" বলা একটি শিরক। কারণ, তুমি নিজের নফসকে বড় জেনে "সোবহানাল্লাহ" বলেছ। আল্লাহ তা'আলার তাযীমের জন্যে বলনি। লোকটি বলল ঃ আমি এটা করব না। অন্য কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ সর্বাগ্রে এটাই করা দরকার। সে বলল ঃ এটা করার সাধ্য আমার নেই। হযরত আবু ইয়াযীদ বললেন ঃ আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, তুমি প্রতিকার কবুল করবে না। হযরত আবু ইয়াযীদ বর্ণিত এই প্রতিকারটি সে ব্যক্তির জন্যে, যে নিজের নফসের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে কামনা করে! এই চিকিৎসা ছাড়া এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। অতএব, যে ব্যক্তি এই চিকিৎসার শক্তি রাখে না, তার কমপক্ষে এর কার্যকারিতায় বিশ্বাস রাখা উচিত। যার মধ্যে এই বিশ্বাসটুকুও নেই, তার দুর্ভোগ নিশ্চিত। হাদীস শরীফে আছে—

لايستكمل ايمان العبد حتى تكون قلة الشى احب اليه من كثرته وحتى يكون ان لايعرف احب اليه من ان يعرف -

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান কামেল হয় না, যে পর্যন্ত তার কাছে কোন বস্তুর স্বল্পতা আধিক্যের তুলনায় অধিক প্রিয় না হয় এবং যে পর্যন্ত খ্যাত না হওয়া তার কাছে খ্যাত হওয়ার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় না হয়। আরও আছে—

ثلاث من كن فيه استكمل ايمانه لايخاف فى الله لومة لائم ولايرى الشئ من عمله وعرض امران احد هما للدنيا والثانى للاخرة اختر امر الاخرة على امر الدنيا -

অর্থাৎ, তিনটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যায়, তার ঈমান কামেল হয়ে যায়। এক, আল্লাহ তা'আলার কাজে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা। দুই, লোক দেখানোর জন্যে কোন আমল না করা। তিন, সামনে দু'টি বিষয় উপস্থিত হলে— একটি দুনিয়ার ও একটি আখেরাতের— আখেরাতের বিষয়টিকে বেছে নেয়া।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—

لايكمل ايمان العبد حتى يكون فيه ثلاث خصال اذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق واذا رضى لم يدخله رحناه فى باطل واذا قد رلم يتناول ماليس له -

অর্থাৎ, বান্দার ঈমান কামেল হয় না যে পর্যন্ত তার মধ্যে তিনটি স্বভাব না পাওয়া যায়। এক, যখন সে ক্রুদ্ধ হয়, তখন তার ক্রোধ তাকে হক থেকে সরিয়ে দেয় না। দুই,যখন সে খুশী হয়, তখন খুশী তাকে অসত্যের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় না। তিন, যখন সে শক্তিশালী হয়, তখন যা তার নয়, সে তা গ্রহণ করে না।

এগুলো হচ্ছে মুমিন হওয়ার শর্ত, যা রসূলে করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। অতএব, সে ব্যক্তির জন্যে আশ্চর্য লাগে, যে ধার্মিকতার দাবী করে অথচ এসব শর্ত থেকে কণা পরিমাণও নিজের মধ্যে পায় না। এছাড়া ঈমানের পর যে সমস্ত স্তর অর্জিত হয়, সেগুলো সে অস্বীকারও করে।

সপ্তম অধ্যায়

নিয়ত, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে ঈমানের রশ্মি ও কোরআনের আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইলম ও আমল ব্যতীত দু'জাহানের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। কেননা, আলেমগণ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ধ্বংসের পথে। আবার আলেমগণের মধ্যেও যারা আমলকারী, তারা ব্যতীত সবাই ধ্বংসের পথে। আবার মুখলেস তথা নিষ্ঠাবান আমলকারী ছাড়া সকল আমলকারীও ধ্বংসের পথে। আবার নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণও মহাসংকটের সম্মুখীন।

মোটকথা, নিয়ত ব্যতীত আমল নিরেট পণ্ডশ্রম। আন্তরিকতা ছাড়া নিয়ত শুধু রিয়া, কপটতা, গোনাহ। আবার সত্যবাদিতা ছাড়া নিষ্ঠাও একটি প্রতারণা বৈ নয়। সেমতে গায়রুল্লাহর নিয়ত মিশ্রিত আমল সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

অর্থাৎ, তারা (রিয়া মিশ্রিত) যে সকল আমল করেছিল, আমি সেগুলোর দিকে অগ্রসর হলাম, অতঃপর সেগুলোকে ধুলার ন্যায় উড়িয়ে দিলাম।

আমরা জানি না, যে ব্যক্তি নিয়তের স্বরূপ জানে না, সে কিভাবে নিয়ত সঠিক করবে? যে নিষ্ঠা সম্পর্কে অজ্ঞ, সে কিভাবে নিষ্ঠা পালন করবে এবং যে সত্যবাদিতার অর্থ বুঝে না, সে কিরূপে সত্যবাদী হবে? তাই আল্লাহর এবাদতের জন্যে প্রথমে নিয়ত শিখতে হবে, এরপর নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার স্বরূপ জানতে হবে। তাই আমরা এই তিনটি বিষয়বস্তুকে তিনটি পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তের ফযীলত

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ –

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

এ আয়াতে "এরাদা" অর্থাৎ, কামনা করার অর্থ নিয়ত করা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

انما الاعمال بالنيات ولكل امرء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه

অর্থাৎ, আমলসমূহ নিয়ত অনুযায়ীই ধর্তব্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়তে অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত সেদিকেই ধর্তব্য হবে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— আমার উম্মতের অধিকাংশ শহীদ শয্যায় মৃত্যুবরণ করবে এবং অনেকে দু'সারির মাঝে নিহত হবে। আল্লাহ জানেন তাদের নিয়ত কি ছিল! আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا –

অর্থাৎ, যদি (বিচারকদ্বয়) সংশোধনের ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ তাদেরকে তাওফীক দান করবেন।

এখানে নিয়তকে তাওফীকপ্রাপ্তির কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুখাকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। অন্তরকে দেখার কারণ এটাই যে, অন্তর হল নিয়তের স্থান। এক হাদীসে আছে, বান্দা সৎকর্ম সম্পাদন করে। ফেরেশতারা সেগুলো মোহর আঁটা থলের মধ্যে নিয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করে। এরশাদ হয়— এই থলে দূরে নিক্ষেপ কর। কেননা, এতে যে সকল

আমল রয়েছে, সেগুলো আমার নিয়তে করা হয়নি। এরপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন, এই ব্যক্তির জন্য এ আমল লিখ, সে আমল লিখ। ফেরেশতারা আরয করে, ইলাহী! এ ব্যক্তি তো এসব আমল করেনি। আল্লাহ বলেন ঃ সে এসব কাজের নিয়ত করেছিল।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— মানুষ চার প্রকার। এক, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইলম ও ধন-সম্পদ দিয়েছেন। সে ইলম অনুযায়ী নিজের ধন-সম্প[illegible]পথে ব্যয় করে। তা দেখে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি বলে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এ ব্যক্তির মত ইলম ও ধন-সম্পদ দান করেন, তবে আমিও তাই করব, যা সে করে। এই উভয় প্রকার মানুষ সমান সমান সওয়াব পাবে। তৃতীয় প্রকার সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন কিন্তু ইলম দান করেননি। সে মূর্খতাবশত নিজের ধন-সম্পদ বাজে কাজে উড়ায়। এটা দেখে চতুর্থ প্রকার ব্যক্তি বলে, আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দিলে আমিও তাই করব, যা এ ব্যক্তি করে। এরা উভয়েই গোনাহে সমান অংশীদার হবে। লক্ষণীয় যে, কেবল নিয়তের কারণেই সৎকর্ম ও অসৎ কর্মে অংশীদার করা হয়েছে।

আনাস ইবনে মালেকের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক যুদ্ধে যাবার সময় বলেন ঃ মদীনায় কিছু লোক রয়েছে, যারা এখানে আমরা যা কিছু করছি অর্থাৎ, বিজন বন অতিক্রম করা, জেহাদে কিছু ব্যয় করা, ক্ষুধায় কষ্ট করা ইত্যাদি সব কিছুতে আমাদের সওয়াবের অংশীদার; অথচ তারা মদীনায়ই রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ তা কেমন করে? তারা যে আমাদের সঙ্গে নেই। তিনি বললেন ঃ ওযরের কারণে তারা আসতে পারেনি। তাই ভাল নিয়তের কারণে সওয়াবে শরীক হয়ে গেছে। এক হাদীসে আছে, কোন এক ব্যক্তি হিজরত করে এক মহিলাকে বিয়ে করলে সে "মুহাজিরে উম্মে কায়স" নামে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবে সে নিজের নিয়তের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে আছে, দুর্ভিক্ষের সময় এক ব্যক্তি বালুর টিলার উপর দিয়ে গমন করে এবং মনে মনে বলে— এই বালু যদি শস্যকণা হয়ে যেত, তবে আমি তা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা তখনকার নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন— এ ব্যক্তিকে বলে দাও, আল্লাহ তোমার দান কবুল করেছেন। ভাল নিয়তের কারণে তোমাকে এই সওয়াব দিয়েছেন, যা এই

পরিমাণ শস্য বন্টন করলে দিতেন। অনেক হাদীসে বলা হয়েছে—

من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা সম্পন্ন করে না, তার জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টির সামনে দারিদ্র্য তুলে ধরেন এবং সে দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে যে আখেরাতের নিয়ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে প্রাচুর্য স্থাপন করে দেন এবং তার কাম্য সামগ্রী সরবরাহ করে দেন; কিন্তু সে দুনিয়াত্যাগী দরবেশ হয়ে পরপারে পাড়ি জমায়।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়, তখন ফেরেশতারা নেমে যোদ্ধাদেরকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি দুনিয়ার জন্যে যুদ্ধ করে, অমুক আত্মগরিমার জন্যে এবং অমুক বিদ্বেষবশত যুদ্ধ করে। সাবধান, কারও সম্পর্কে বলো না যে, সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী সমুচ্চে তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আহনাফ ইবনে কায়েসের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار

অর্থাৎ, যখন দু'মুসলমান নিজ নিজ তরবারি নিয়ে মারমুখী হয়ে যায়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ একজন তো হত্যাকারী হওয়ার কারণে জাহান্নামী হয়, নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামী হয়? তিনি বললেন ঃ কারণ, সে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি নির্ধারিত কোন মোহরানার উপর কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তা শোধ করার নিয়ত না রাখে, সে যিনা করে। আর যে পরিশোধ না করার নিয়তসহ করয গ্রহণ করে, সে চোর।

নিয়তের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও বুযুর্গগণের উক্তি এরূপ ঃ হযরত

ওমর (রাঃ) বলেন— সর্বোত্তম আমল তাই, যা আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকা। যেসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে, সেগুলোতে নিয়ত সঠিক করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে লিখেন— আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার নিয়ত পূর্ণ হবে, তার জন্যে আল্লাহর সাহায্যও পূর্ণ হবে। যার নিয়তে ত্রুটি থাকবে, তার জন্যে সাহায্যও ত্রুটিযুক্ত হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক ক্ষুদ্র কাজ নিয়তগুণে বড় কাজ হয়ে যায় এবং অনেক বড় কাজ নিয়ত দোষে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেন ঃ আগেকার লোকেরা নিয়ত যত্নসহকারে শিখতেন, যেমন আজকাল তোমরা আমল শিখ। হেলাল ইবনে সা'দ বলেন ঃ বান্দা ঈমানদারের মত কথাবার্তা বলে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার আমল না দেখে তাকে এবং তার কথাবার্তাকে ছাড়পত্র দেন না। যদি সে আমল করে, তবে তার পরহেযগারী দেখেন। যদি পরহেযগারীও থাকে, তবে নিয়ত দেখেন! নিয়ত সঠিক হলে তার সকল কাজ সঠিক হয়। মোটকথা, নিয়ত হচ্ছে আমলের ভিত্তি। আমল ভাল হওয়ার জন্যে নিয়ত ভাল হতে হবে। নিয়ত নিজেই উত্তম, যদিও কোন বাধার কারণে আমল না হয়।

নিয়তের স্বরূপ ঃ নিয়ত, এরাদা ও কসদ— এগুলো আরবী ভাষার সমার্থবোধক শব্দ। এটা ইলম ও আমলের মধ্যবর্তী একটি আন্তরিক গুণ। ইলম আগে এবং আমল পরে আসে। কেননা, আমল হচ্ছে এই গুণের ফল ও শাখা। বলা বাহুল্য, কোন আমল সম্পন্ন হওয়ার জন্যে তিনটি বিষয় জরুরী— ইলম, ইচ্ছা ও ক্ষমতা। কেননা, মানুষ যে কাজের ইলম রাখে না, তা করার ইচ্ছা করে না। উদাহরণতঃ মানুষ খাদ্যবস্তুকে না জানলে ও না চিনলে তা খাওয়া তার জন্যে সম্ভব নয়। খাদ্যবস্তুকে জানাও যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত তা খাওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টি না হয়। আবার আগ্রহ ও ইচ্ছাও খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত ক্ষমতা না থাকে— যেমন, পঙ্গু ব্যক্তি খাদ্য চিনে এবং তা খাওয়ার ইচ্ছাও রাখে; কিন্তু পঙ্গুত্বের কারণে খেতে পারে না। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গতিশীল হয় না। ক্ষমতা ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে এবং ইচ্ছা ইলমের পরে জাগ্রত হয়। অতএব, ইচ্ছা ও নিয়ত হল ইলম ও ক্ষমতার মধ্যবর্তী একটি গুণ।

নিয়ত আমলের চেয়ে উত্তম ঃ

نية المؤمن خير من عمله

অর্থাৎ, মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

হাদীসে বর্ণিত এ উক্তির কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন— নিয়তকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ এই যে, নিয়ত একটি গোপন বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ তা জানে না। পক্ষান্তরে আমল প্রকাশ্য বিষয়। অবশ্য গোপন আমলের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এতে জনহিতকর কাজ নিয়ে চিন্তাভাবনার নিয়ত স্বয়ং চিন্তা-ভাবনার চেয়ে উত্তম হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কখনও ধারণা করা হয় যে, নিয়তের অগ্রাধিকারের কারণ হচ্ছে নিয়ত আমলের পরিণতি পর্যন্ত থাকে, আর আমল সর্বক্ষণ থাকে না। এ ধারণাও অগ্রাহ্য। কারণ, এতে অধিক আমল অল্প আমলের চেয়ে উত্তম হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নিয়ত সর্বক্ষণ থাকাও জরুরী নয়। কেননা, নামায আমলের নিয়ত কখনও কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে এবং আমল অনেকক্ষণ থাকে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, কেবল নিয়ত এমন আমলের চেয়ে উত্তম, যাতে নিয়ত থাকে না। এরূপ আমল এবাদত নয়; কিন্তু নিয়ত সর্বাবস্থায় এবাদত— আমল হোক বা না হোক। উদ্দেশ্য এই যে, যে এবাদতে নিয়ত ও আমল উভয়টি থাকে, তাতে নিয়ত আমলের তুলনায় উত্তম। সুতরাং হাদীসের অর্থ এই, মুমিনের নিয়ত যা তার এবাদতের একটি অংশ, সে আমলের চেয়ে উত্তম, যা তার এবাদতেরই অংশ।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না এদের মাংস, না এদের রক্ত; কিন্তু পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি।

বলা বাহুল্য, তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের আমল। অতএব, অন্তরের আমল সর্বাবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল অপেক্ষা উত্তম হবে। নিয়ত যেহেতু সৎকর্মের প্রতি অন্তরের প্রবণতাকে বলা হয়, তাই নিয়তের শ্রেষ্ঠত্বও জরুরী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উদ্দেশ্য অন্তরকে সৎকর্মে অভ্যস্ত করা

এবং সৎকর্মের প্রবণতাকে পাকাপোক্ত করা। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যের পরিমাপেই আমল উত্তম হবে। নিয়তে এ উদ্দেশ্য অর্জিত রয়েছে। তাই নিয়তই শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ পাকস্থলীতে ব্যথা হলে তার এক চিকিৎসা হচ্ছে উপরে ঔষধের প্রলেপ দেয়া এবং অন্য চিকিৎসা হচ্ছে ঔষধ পান করানো, যা পাকস্থলীতে পৌছে যাবে। এখানে ঔষধ পান করা, প্রলেপ দেয়ার তুলনায় উত্তম হবে। কেননা, ঔষধের প্রভাব পাকস্থলীতে পৌছানোই আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ঔষধ পান করানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়। কারণ, এতে ঔষধ পাকস্থলীর সাথে মিলিত থাকে। সুতরাং এটা অধিক উপকারী হবে।

অনুরূপভাবে এবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের পরিবর্তন ও সদগুণাবলী অর্জন— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া নয়। উদাহরণতঃ সেজদার উদ্দেশ্য মাটিতে কপাল রাখা নয়; বরং অন্তরের গুণ নম্রতাকে মযবুত ও পাকাপোক্ত করা । অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নম্রতা অনুভব করে, সে যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নম্রতা অর্জনে সহায়ক থাকার আকৃতি দেবে, তখন তার নম্রতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এতীমের প্রতি দয়ার্দ্রতা অনুভব করে, সে যখন এতীমের মাথায় হাত বুলাবে এবং আদর করবে, তখন তার অন্তরের গুণটি অধিক মযবুত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ত ব্যতীত আমল মোটেই উপকারী নয়। যেমন , কেউ এতীমের মাথায় হাত বুলায়; কিন্তু মন গাফেল থাকে কিংবা মনে করে সে কাপড়ের উপর হাত বুলাচ্ছে। এরূপ আমল দ্বারা অন্তর এতটুকুও প্রভাবান্বিত হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গাফেল অবস্থায় সেজদা করে এবং মন থাকে দুনিয়ার চিন্তায় মশগুল, তার অন্তরও প্রভাবিত হবে না এবং নম্রতা মযবুত করতেও সহায়ক হবে না। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে এ ধরনের সেজদা করা না করা সমান। এরূপ সেজদাকে বাতিল ও বেকার বলা হয়। কিন্তু সেজদার উদ্দেশ্য যদি রিয়া হয় কিংবা কোন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়, তবে তা করা না করা সমান হবে না; বরং একটি অনিষ্ট বেড়ে যাবে। আমলের চেয়ে নিয়ত উত্তম হওয়ার এটাই আসল কারণ। এ থেকে অন্য একটি হাদীসের অর্থও বুঝা যায়। বলা হয়েছে—

من هم حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সৎকর্মের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা করে না, তার

জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

কেননা, নিয়তের অর্থ হচ্ছে সৎকর্মের প্রতি অন্তরের ঝোঁক, যা একান্ত সদগুণ। আমল দ্বারা এই গুণ অধিক জোরদার হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কোরবানীর জন্তু যবেহ করার উদ্দেশ্য গোশত ও রক্ত নয়; বরং দুনিয়ার মহব্বত থেকে অন্তরকে ফিরানো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর পথে জন্তুকে উৎসর্গ করা। এটা নিয়ত ও দৃঢ় ইচ্ছার সাথে সাথে অর্জিত হয়ে যায়। যদি কোন বাধার কারণে যবেহ নাও হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, কিছু লোক মদীনায় থেকেও জেহাদে আমাদের সাথে শরীক। কেননা, তাদের নিয়তও তাদের মত ছিল, যারা জেহাদে বের হয়েছিল। বিশেষ ওযরবশতই তারা দৈহিকভাবে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

নিয়ত সম্পর্কিত আমলের বিবরণ ঃ আমল তিন প্রকার— গোনাহ, এবাদত ও অনুমোদিত কর্ম। নিয়তের কারণে এই তিন প্রকারে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম, গোনাহের ক্ষেত্রে নিয়তের কারণে কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং انما الاعمال بالنيات অর্থাৎ, নিয়তগুণে কর্ম এ হাদীস শুনে যদি কোন মূর্খ মনে করে, গোনাহ নিয়তের গুণে এবাদত হয়ে যায়, তবে তা নিরেট ভুল হবে। উদাহরণতঃ কেউ এক ব্যক্তির খাতিরে অন্যের গীবত করলে কিংবা অন্যের মাল ফকীরকে খাইয়ে দিলে কিংবা হারাম ধন-সম্পদ দিয়ে মাদ্রাসা অথবা মসজিদ নির্মাণ করলে তা হবে মূর্খতার কাজ। নিয়তের গুণে এসব কাজের যুলুম ও গোনাহ বিলুপ্ত হবে না। বরং শরীয়তের চাহিদার বিপরীতে এসবে সৎকর্মের নিয়ত করা আলাদা গোনাহ। কেউ জেনে-শুনে এরূপ করলে সে হবে শরীয়তের দুশমন। না জেনে করলে অজ্ঞানতার কারণে গোনাহগার হবে। কেননা, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কোন্ কর্ম সৎকর্ম, তা শরীয়ত দ্বারাই জানা যায়। সুতরাং যে কাজ অসৎ, তা সৎকর্ম কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই হযরত সহল বলেন ঃ মূর্খতাবশত আল্লাহর নাফরমানীর চেয়ে বড় কোন নাফরমানী নেই, যেমন জ্ঞানবশত আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে বড় কোন আনুগত্য নেই। সারকথা, যে ব্যক্তি মূর্খতার কারণে গোনাহ দ্বারা সৎকর্মের নিয়ত করবে, তার মূর্খতাজনিত আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। তবে এক অবস্থায় গ্রাহ্য হবে, যদি সে অল্প দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে এবং

এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ না পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তবে যারা জেনে স্মরণ রেখেছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

لايعذر الجاهل على الجهل ولايحل للجاهل ان يمكره على جهله ولا للعالم ان يسكت على علمه -

অর্থাৎ, মূর্খ তার মূর্খতার কারণে ক্ষমার যোগ্য হবে না। মূর্খের জন্যে মূর্খতার উপর অবস্থান করা জায়েয নয়। তেমনি আলেমের জন্যে চুপ থাকা জায়েয নয়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, "নিয়তগুণে কর্ম" হাদীসটি বিশেষভাবে এবাদত ও অনুমোদিত কর্মসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— গোনাহের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, এবাদত নিয়তের কারণে গোনাহ হয়ে যায় এবং নিয়তের কারণেই এবাদতও থাকে। অনুমোদিত কর্মের অবস্থাও তাই অর্থাৎ নিয়ত দ্বারা তা গোনাহ ও এবাদত উভয়টিই হতে পারে। কিন্তু গোনাহ কোন প্রকারেই এবাদত হতে পারে না; বরং বদ নিয়তের কারণে তা অধিকতর গুরুতর গোনাহ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়, এবাদত দুটি বিষয়ে নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত— বিশুদ্ধতা এবং অধিক সওয়াবপ্রাপ্তি। এবাদত বিশুদ্ধ তখন হবে, যখন আল্লাহর এবাদতের নিয়ত করা হবে— অন্য কিছুর নয়। অতএব, রিয়া তথা লোক দেখানোর নিয়ত করলে এবাদত গোনাহে পরিণত হবে। এবাদতের সওয়াব অধিক তখন হয়, যখন একই আমলে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করা হয়। এরূপ করলে প্রত্যেক নিয়তের জন্যে আলাদা এক সওয়াব পাওয়া যায়। কেননা, প্রত্যেক নিয়তই একটি নেকী। হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক নেকীর পেছনে দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে বসে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করতে পারে। প্রথমত, মসজিদে বসে পরওয়ারদেগারের যিয়ারতের নিয়ত করবে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর ঘর। যে এখানে আসে, তার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور اكرام زائره -

অর্থাৎ, যে মসজিদে বসে, সে আল্লাহ তা'আলার যিয়ারত করে। যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য যিয়ারতকারীর সমাদর করা। দ্বিতীয়ত, এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করার নিয়ত করবে, যাতে যতক্ষণ অপেক্ষা করা হয়, ততক্ষণই নামাযে থাকার সওয়াব পাওয়া যায়। কোরআন মজীদে উল্লিখিত رَابِطُوْا বাক্যে একথাই বুঝানো হয়েছে। তৃতীয়ত, কান, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রেখে সংসারত্যাগী হওয়ার নিয়ত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

رهبانية امتى القعود فى المساجد -

অর্থাৎ, আমার উম্মতের সংসার ত্যাগ হচ্ছে মসজিদে বসা।

চতুর্থত, সাহসিকতাকে আল্লাহতে সীমিত করা। পঞ্চমত, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে একাকী হওয়া। হাদীসে আছে—

من غدا الى المسجد ليذكر الله تعالى اويذكر به كان كالمجاهد فى سبيل الله -

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে অথবা স্মরণের উপদেশ দেওয়ার জন্যে মসজিদে যায়, সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর অনুরূপ।

ষষ্ঠত, কোন মুসলমান ভাইয়ের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নিয়ত করবে। সপ্তমত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার নিয়ত করবে। কেননা, মসজিদে এমন লোকও থাকে, যারা নামায ভালরূপে পড়তে পারে না অথবা অবৈধ কাজকর্ম করে। অষ্টমত, আল্লাহ তা'আলার কাছে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে গোনাহ ত্যাগ করার নিয়ত করবে। অনেক নিয়ত করার

এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। সকল এবাদতেই এরূপ মনে করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক এবাদতেই অনেক প্রকার নিয়ত করার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়, অনুমোদিত কর্মসমূহের মধ্যেও এমনি ধরনের এক অথবা একাধিক নিয়ত হতে পারে। ফলে, অনুমোদিত কাজও উৎকৃষ্ট এবাদতে পরিণত হতে পারে। বড় ক্ষতি তাদের, যারা এ বিষয়ে গাফেল। কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে, এসব কাজ কি নিয়তে করা হয়েছিল? এটা সেই অনুমোদিত কাজের বেলায়, যাতে কারাহাতের (অর্থাৎ মাকরূহ হওয়ার) মিশ্রণ নেই। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

حلالها حساب وحرامها عقاب – (এর হালালে হিসাব আছে এবং হারামে শাস্তি আছে)। মুয়ায ইবনে জাবালের হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ان العبد ليسأل يوم القيامة من كل شيئ حتى عن كحل عينه وعن فتات الطينة باصبعه وعن لمس ثوب اخيه –

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন বান্দা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, এমনকি, নিজের চোখের সুরমা, অঙ্গুলি দ্বারা মাটি খোঁড়া এবং নিজের ভাইয়ের কাপড় স্পর্শ করা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে সুগন্ধি লাগায়, সে কিয়ামতের দিন যখন উত্থিত হবে, তখন তার সুগন্ধি মেশকের চেয়েও উৎকৃষ্ট হবে। আর যে অন্যের জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন তার দুর্গন্ধ মৃতের চেয়েও বেশী হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, সুগন্ধি লাগানো একটি মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ। কিন্তু তাতে সুনিয়ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। প্রশ্ন হয় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করা একটি মানসিক আনন্দের কাজ। তা আল্লাহর জন্যে কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, যে ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করে, তার উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করা অথবা গর্ব ও প্রাচুর্য প্রকাশ করা অথবা মানুষকে দেখানো হতে পারে, যাতে মানুষের অন্তরে তার স্থান হয় এবং মানুষ তাকে খোশবুপ্রিয় ও রুচিশীল বলে আখ্যায়িত করে। যে পরনারীকে দেখে, তার খোশবু লাগানোর উদ্দেশ্য নিজের প্রতি পরনারীকে আকৃষ্ট করা হতে পারে। এসব

কারণে সুগন্ধি ব্যবহার করা গোনাহের কারণ। এ কারণেই কিয়ামতে এর দুর্গন্ধ মৃতের চেয়েও বেশী হবে। কিন্তু কেবল প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করা গোনাহ নয়। তবে জিজ্ঞাসা এ সম্পর্কেও করা হবে। যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তার শাস্তি হবে। যে সব নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার আল্লাহর জন্যে হয়, সেগুলো এই— জুমআর দিন খোশবু লাগিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা, আল্লাহর ঘরের তাযীমের নিয়ত করা, নিজ দেহ থেকে দুর্গন্ধ দূর করার নিয়ত করা, যাতে নিকটে উপবেশনকারীদের কষ্ট না হয়, আপন মস্তিষ্কের চিকিৎসার নিয়ত করা, যাতে সুগন্ধি দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয় বিষয়ে চিন্তা করা সহজ হয়। ইমাম শাফেঈ বলেন ঃ যার খোশবু ভাল হয়, তার বুদ্ধি বাড়ে। মোটকথা, এমনি ধরনের আরও অনেক নিয়ত আছে। অন্তরে আখেরাতের তেজারত ও সৎকর্মের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হলে এরূপ নিয়ত করতে কেউ অক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে অন্তরে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা প্রবল হলে এসব নিয়ত মনে জাগ্রত হয় না।

মুবাহ তথা অনুমোদিত কর্ম যেমন গণনার বাইরে, তেমনি সেগুলোতে নিয়তেরও কোন শেষ নেই। নিম্নে বর্ণিত একটি উদাহরণ দ্বারা বাকীগুলোকে অনুমান করে নেয়া যায়। জনৈক সাধক বলেন— আমি মুস্তাহাব মনে করি যে, প্রত্যেক কাজে একটি না একটি নিয়ত করে নিই; এমনকি পানাহার, নিদ্রা, মলত্যাগ এবং অন্যান্য সব কাজে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত হওয়া চাই। কেননা, যে কাজ শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক অবসর লাভের কারণ হয়, তা ধর্মে-কর্মে সহায়ক হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ যে ব্যক্তি পানাহারে এবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত করে এবং স্ত্রী-সহবাসে পত্নীর মনোরঞ্জন ও সুসন্তান লাভের নিয়ত করে, সে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস দ্বারা এবাদত পালনকারী গণ্য হবে। যার মনে আখেরাতের চিন্তা প্রবল, তার জন্যে এ দু'টি প্রধান কাজে সৎকর্মের নিয়ত করা অসম্ভব নয়। এমনিভাবে যখন কারও ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন তাতেও সৎ নিয়ত করে সে ধন-সম্পদকে "ফী সাবীলিল্লাহ" বলে দেয়া উচিত। যখন শুনে যে, কেউ তার গীবত করে, তখন এ ভেবে খুশী হবে যে, এর বিনিময়ে গীবতকারী তার আমলনামা থেকে পাপ নিয়ে যাচ্ছে এবং গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকীসমূহ তার আমলনামায় চলে আসছে। কোন জওয়াব না দিয়ে এবং সম্পূর্ণ চুপ থেকে এ বিষয়ের নিয়ত করবে।

হাদীস শরীফে আছে— হিসাব-নিকাশের পর বান্দার নিজস্ব আমল যখন বেকার হয়ে যাবে এবং সে দোযখের যোগ্য হয়ে যাবে, তখন তার জন্যে সৎকর্মের এমন আমলনামা খোলা হবে, যা দ্বারা সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। বান্দা এই আমলনামা দেখে বিস্মিত হয়ে বলবে— ইলাহী, এসব আমল তো আমি কখনও করিনি। তাকে বলা হবে, এসব আমল সে লোকদের, যারা তোমার গীবত করেছিল। এখন এগুলো তুমি পেয়ে গেছ।

নিয়ত ইচ্ছাধীন নয় ঃ মূর্খ ব্যক্তি যখন নিয়তের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ শুনে, তখন সে তার যাবতীয় কাজের শুরুতে মনে মনে বলে— আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যবসায়ের নিয়ত করছি অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়ার নিয়ত করছি। এতেই সে মনে করে, বুঝি নিয়ত হয়ে গেছে। অথচ এটা মনের জল্পনা মাত্র। নিয়তের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, যে বিষয়ের সাথে মনের বর্তমান অথবা ভবিষ্যত স্বার্থ জড়িত, তার প্রতি মনের উত্তেজনা ও প্রবণতাকে বলা হয় নিয়ত। প্রবণতা না থাকলে কেবল ইচ্ছার মাধ্যমে নিয়ত হাসিল করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক কাজের সাথে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ জড়িত, তখন সে সেই কাজের দিকে মনোযোগী হয়। মনে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। উদাহরণতঃ যার বিশ্বাসে সন্তান জন্মগ্রহণের কোন ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক উদ্দেশ্য নেই, তার পক্ষে স্ত্রী-সহবাসের সময় সন্তানের নিয়ত করা সম্ভব নয়। তার সহবাসের উদ্দেশ্য হবে কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কেননা, নিয়ত উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে উদ্দেশ্য, কামবাসনা চরিতার্থ করা। অনুরূপভাবে যদি অন্তরে এ বিশ্বাস প্রবল না থাকে যে, বিবাহ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত প্রতিপালন করা হয়, তবে বিবাহে সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মুখে 'সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করলাম, বলে দিলে নিয়ত হয়ে যাবে না। হাঁ, এই নিয়ত হাসিল করার পদ্ধতি হল— প্রথমে শরীয়তের প্রতি এবং উম্মতে মোহাম্মদীর সংখ্যাবৃদ্ধি চেষ্টা করলে যে অসীম সওয়াব হয়, সে বিষয়ের প্রতি ঈমান মযবুত করা। এরপর সন্তান লালন-পালনের কষ্ট সম্পর্কিত যাবতীয় বিরুদ্ধ ভাব মন থেকে দূর করে দেয়া। এরূপ করলে সন্তান লাভের সত্যিকার নিয়ত অর্জিত হতে পারে।

মোটকথা, নিয়তের জন্যে মনের উত্তেজনা ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের বিশ্বাস পূর্ব থেকে থাকা উচিত বিধায় অনেক পূর্ববর্তী বুযুর্গ কোন কোন সৎকাজ

সম্পাদন করতে দ্বিধা করেছেন। কারণ, তাদের মধ্যে সে সৎকাজের নিয়ত উপস্থিত ছিল না। বর্ণিত আছে, ইবনে সীরীন (রঃ) হযরত হাসান বসরীর জানাযার নামায পড়েননি এবং বলেন ঃ আমার মনে নিয়ত উপস্থিত হয় না। কুফার আলেম হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মানের ইন্তেকাল হলে হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল— আপনি তাঁর জানাযায় যাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার মধ্যে নিয়ত থাকলে অবশ্যই যেতাম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কাছে কেউ কোন সৎকর্মের অনুরোধ জানালে তারা জওয়াব দিতেন— যদি আল্লাহ নিয়ত দান করেন, তবে অবশ্যই করব। হযরত তাউস (রহঃ) নিয়ত ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতেন না। কেউ কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করলেও তিনি জওয়াব দিতেন না। আবার নিয়ত থাকলে জিজ্ঞাসা ছাড়া আপনা-আপনিই বর্ণনা শুরু করতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ ব্যাপার কি! কোন সময় আপনি প্রশ্নের উত্তরেও হাদীস বর্ণনা করেন না, আবার কোন সময় আপনা-আপনি বর্ণনা করেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি চাও যে, নিয়ত ছাড়াই আমি হাদীস বর্ণনা করি? যখন আমার মধ্যে নিয়ত উপস্থিত হয়, তখনই বর্ণনা করি। হযরত তাউস (রহঃ)-কে কেউ বলল ঃ আমার জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ যখন নিজের মধ্যে নিয়ত পাব, তখন করব। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি এক মাস ধরে জনৈক রোগীকে দেখতে যাওয়ার নিয়ত তালাশ করছি। এখন পর্যন্ত সঠিক নিয়ত পাইনি।

আগেকার দিনের বুযুর্গগণের রীতি ছিল যে, তারা নিয়ত ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তারা জানতেন, নিয়ত হচ্ছে আমলের প্রাণ। সত্যনিষ্ঠ নিয়ত ছাড়া আমল রিয়ার নামান্তর। এরূপ আমল খোদায়ী গযবের কারণ— নৈকট্যের নয়। তারা আরও জানতেন যে, মুখে "নিয়ত করি" বলার নাম নিয়ত নয়। বরং এটা অন্তরের প্রেরণা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে উন্মোচনের স্থলবর্তী। মাঝে মাঝে অর্জিত হয় এবং মাঝে মাঝে হয় না। যার মনে অধিকাংশ সময় ধর্মীয় জ্ঞান প্রবল থাকে, তার অধিকাংশ সময় নিয়ত অর্জিত হয়। আর যার মনে দুনিয়া প্রবল থাকে, তার এটা অর্জিত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখলাসের ফযীলত

এখলাস সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-

অর্থাৎ, তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল খাঁটিভাবে আল্লাহর এবাদত করতে।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ -

অর্থাৎ, সাবধান! খাঁটি এবাদত আল্লাহরই হয়ে থাকে।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ -

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তওবা করে, সংশোধিত হয়, আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করে এবং আপন এবাদতকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করে।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۤءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا -

অর্থাৎ, অতএব যে তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং নিজের পালনকর্তার এবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

এ আয়াতটি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমল করে এবং তজ্জন্যে মানুষের প্রশংসা কামনা করে না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم اخلاص العمل لله

والنصيحة للولاة ولزوم الجماعة -

অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে মর্দে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না— আল্লাহর জন্যে আমলকে খাঁটি করা, শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দেয়া এবং মুসলিম দলের সাথে থাকা।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এখলাস আমার রহস্য। আমি যাকে ইচ্ছা এই রহস্য অবগত করি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমলের স্বল্পতার জন্যে চিন্তিত হয়ো না; বরং কবুল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হও। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) একবার মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন—

اخلص العمل يجزءك منه القليل -

অর্থাৎ, এখলাস সহকারে আমল কর। এরূপ আমল অল্পই তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে—

ما من يخلص لله العمل اربعين يوما الا ظهرت ينابيع الحكم -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাস সহকারে আমল করে, তার অন্তর ও জিহ্বা থেকে প্রজ্ঞার ঝরনা প্রবাহিত হতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও এরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১) যাকে ইলম দান করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি তোমার ইলম দিয়ে কি করেছ? সে বলবে ঃ ইলাহী, দিবারাত্রি আমি এরই খেদমত করেছি। আল্লাহ বলবেন— তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার বাসনা ছিল যেন মানুষ তোমাকে আলেম বলে। অতঃপর ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ বলবেন ঃ মনে রেখ, তোমাকে দুনিয়াতে আলেম বলা হয়ে গেছে। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাকে প্রশ্ন করবেন— তুমি তোমার

ধন-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ? সে বলবে— পরওয়ারদেগার, আমি দুনিয়াতে দিবারাত্রি সদকা-খয়রাত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন— তুমি মিথ্যা বলছ। তৎসঙ্গে ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। আল্লাহ আরও বলবেন, বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। বস্তুত তা বলা হয়ে গেছে। (৩) যে আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, আল্লাহ তাকে বলবেন— তুমি কি করেছ? সে বলবে, ইলাহী, তুমি জেহাদের নির্দেশ দিয়েছিলে। তাই আমি যুদ্ধ করেছি এবং তোমার পথে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন— তুমি মিথ্যাবাদী। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আরও বলবে— বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মানুষ তোমাকে একজন মহাবীর বলে। তা বলা হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উরুতে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ হে আবু হোরায়রা, সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তিকে দিয়েই জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে। হযরত আবু হোরায়রা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন, অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ পাক ঠিকই বলেছেন —

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেই। তারা এতে ঠকে না।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীতে বর্ণিত আছে, জনৈক আবেদ দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে নিয়োজিত ছিল। একদিন কিছু লোক তার কাছে এসে বলল ঃ এখানে একটি সম্প্রদায় বৃক্ষের পূজা করে। আবেদ রাগান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ কুড়াল কাঁধে নিয়ে বৃক্ষটি কেটে ফেলার জন্যে রওয়ানা হল। পথে শয়তান এক বুড়োর বেশে তার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আবেদ বলল ঃ আমি অমুক বৃক্ষটি কেটে ফেলতে চাই। বুড়ো বলল ঃ তুমি নিজের এবাদত ও কাজকর্ম ছেড়ে এ

বৃক্ষের পেছনে পড়লে কেন? এতে তোমার কি লাভ? আবেদ বলল ঃ এটাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। বুড়ো শয়তান বলল ঃ আমি তোমাকে এটা কাটতে দেব না। কথা কাটাকাটি চরমে পৌঁছলে আবেদ বুড়োকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসল। বুড়ো বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কিছু উপকারী কথা বলতে চাই। আবেদ দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ো বলল ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর এ বৃক্ষ কাটা ফরয করেননি। তুমিও এর এবাদত কর না। যদি অন্য কেউ এবাদত করে, তবে তার গোনাহ তোমার উপর বর্তাবে না। ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর অনেক পয়গম্বর রয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে বৃক্ষ এলাকায় কোন পয়গম্বর পাঠিয়ে তাকে বৃক্ষ কর্তনের নির্দেশ দেবেন। যে কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তার পেছনে পড়ার প্রয়োজন তোমার আছে কি? আবেদ বলল ঃ আমি অবশ্যই বৃক্ষটি কর্তন করব। বুড়ো পুনরায় কুস্তি লড়ার ভাব প্রকাশ করলে আবেদ তাকে পুনরায় ভূতলশায়ী করে দিল এবং বুকের উপর চেপে বসল। বুড়োবেশী শয়তান অপারগ হয়ে বলতে লাগল ঃ এস, আমি তোমাকে আরও একটি কথা বলব, যা তোমার জন্যে নিশ্চিতই উত্তম ও কল্যাণকর হবে। আবেদ বলল ঃ আচ্ছা বল কি বলতে চাও। বুড়োবেশী শয়তান বলল ঃ আগে আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর বলব। আবেদ তাকে ছেড়ে দিল। বুড়ো বলল ঃ তুমি একজন অভাবী মানুষ। পরের দেয়া অন্ন ভক্ষণ কর। আমার মনে হয় অপরকে খাওয়াবার, প্রতিবেশীদের খাতির-আপ্যায়ন করার এবং অমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকার সাধ তোমার মনেও আছে। আবেদ বলল ঃ এ সাধ কার না আছে? বুড়ো বলল ঃ তা হলে এখন তুমি ফিরে যাও। আমি এখন থেকে প্রতিরাত্রে তোমার শিয়রে দু'টি দীনার রেখে দেব। ভোরে এগুলো তুলে নিও এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে সেগুলো ব্যয় করো। এটা তোমার জন্যে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যে বৃক্ষ কর্তনের তুলনায় অধিক উপকারী হবে। এ বৃক্ষটি কেটে কোন লাভ নেই। কারণ, এর জায়গায় অন্য বৃক্ষ রোপণ করা হবে এবং পূজা করা হবে। আবেদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনে মনে বলল ঃ বুড়ো ঠিকই বলেছে। আমি তো পয়গম্বর নই যে, বৃক্ষটি কাটা আমার জন্যে অপরিহার্য হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এটা কাটার হুকুমও করেননি, যা না কাটলে আমি নাফরমান সাব্যস্ত হব। সে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে

উপকারও রয়েছে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে দীনারের ব্যাপারে পাকাপোক্ত চুক্তি হয়ে গেল।

আবেদ তার এবাদতখানায় ফিরে এল এবং রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে সে শিয়রের কাছে দু'টি দীনার পেয়ে তুলে নিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও তাই হল। এরপর কোনদিন সে দীনারের দেখা পেল না। সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে একদিন কাঁধে কুড়াল নিয়ে সে বৃক্ষের উদ্দেশে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে বুড়োবেশী ইবলীসও তার সামনে এসে বলল ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? আবেদ বলল, সে বৃক্ষ কর্তন করতে যাচ্ছে। ইবলীস বলল ঃ এখন তুমি সে বৃক্ষ কর্তন করতে পারবে না এবং সে পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হবে না। একথা শুনে আবেদ প্রথমবারের মত বুড়োকে মাটিতে ফেলে দিতে চাইল। বুড়োবেশী ইবলীস বলল ঃ এখন সে দিন বাসি হয়ে গেছে। অতঃপর সে আবেদকে উপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারল এবং লাথির উপর লাথি মারতে লাগল। আবেদকে তার পায়ে বলের মত মনে হচ্ছিল। এরপর ইবলীস তার ছাতির উপর বসে বলল ঃ হয় তুমি এ কার্জ থেকে বিরত হবে, না হয় আমি তোমাকে যবেহ করে ফেলব। আবেদ নিজের ভেতরে মোকাবিলার শক্তি না পেয়ে হার মেনে নিল এবং বলল ঃ এখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল পূর্বে আমি কিরূপে জয়ী হয়েছিলাম এবং এখন তুমি কিভাবে জয়ী হলে? ইবলীস বলল ঃ এর কারণ, পূর্বে তুমি যা করেছিলে, তা আল্লাহর জন্যে করেছিলে এবং এখলাসের বলে বলীয়ান ছিলে। কিন্তু এখন তুমি ক্রোধ ও দুনিয়ার হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে মাঠে নেমেছ। তাই আমি অনায়াসেই তোমাকে পরাভূত করে দিয়েছি।

সত্যি বলতে কি, উপরোক্ত কাহিনীতে নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যায়ন ও সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

অর্থাৎ,(শয়তান বলল ঃ) আমি অবশ্যই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। কিন্তু যারা তোমার এখলাস বিশিষ্ট বান্দা, তাদের কথা আলাদা।

কেননা, এখলাস ছাড়া বান্দা শয়তানের হাত থেকে ছাড়া পায় না। তাই হযরত মারূফ কারখী নিজেকে প্রহার করতেন এবং বলতেন— হে নফস, এখলাস অবলম্বন কর যাতে মুক্তি পাও। ইয়াকুব মককুফ বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে নেক কর্মসমূহকে গোপন করা, যেমন কুকর্মসমূহকে গোপন

করা হয়। আবু সোলায়মান বলেন, যার একটি পদক্ষেপও সঠিক হয় এবং তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ত না থাকে, সেই সুখী।

এখলাসের স্বরূপ ঃ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ থাকা সম্ভব। কোন বস্তু অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হলে,তাকে বলা হয় "খালেস" বা খাঁটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ -

অর্থাৎ, গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে নির্গত খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্যে সুপেয়।

অতএব দুধের মধ্যে গোবর ও রক্তের সংমিশ্রণ না থাকাই হচ্ছে দুধের খাঁটিত্ব। এখলাস অর্থ খাঁটি করা এবং এর বিপরীত হচ্ছে এশরাক অর্থাৎ শরীক করা। এ থেকে বুঝা যায়, যে মুখলেস নয়, সে মুশরেক। তবে শিরকের অনেক স্তর রয়েছে। তাওহীদের ক্ষেত্রে এখলাসের বিপরীত হচ্ছে উপাস্যতায় এশরাক। শিরকের মত এখলাসও কিছু গোপন এবং কিছু প্রকাশ্য। শিরক ও এখলাসের স্থান হচ্ছে অন্তর। নিয়তের মাধ্যমে উভয়টি অন্তরে উপস্থিত হয়। একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ সম্পাদিত হয় এবং তাতে অন্য কোন উদ্দেশ্যের মিশ্রণ না থাকে, তাই এখলাস হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ কেউ শুধু রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল অথবা শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান করল,আভিধানিক দিক দিয়ে উভয়টিকেই এখলাস বলা হবে। কেননা, এতে এক উদ্দেশ্যের সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ নেই। কিন্তু পরিভাষায় কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দান করাকেই এখলাস বলা হয়। রিয়ার উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এখানে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখানে আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, নৈকট্য লাভের নিয়তের সাথে রিয়া অথবা অন্য কোন মানসিক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকলে তার বিধান কি হবে? উদাহরণতঃ কেউ নৈকট্য লাভের নিয়তে রোযা রাখে কিন্তু সাথে সাথে চিকিৎসার খাতিরে পরহেযের উপকারও হয়ে যায়। অথবা কেউ হজ্জ করে যাতে দেশ ভ্রমণের আনন্দও অর্জিত হয়ে যায়। কিংবা শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা হাসিল হয়ে যায়। অথবা কেউ

তাহাজ্জুদ পড়ে যাতে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে হেফাযতও হয়ে যায়। অথবা কেউ উযু করে যাতে হাত পায়ের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং দেহ ঠাণ্ডা থাকে। এসব ক্ষেত্রে নৈকট্য লাভের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকার কারণে আমলসমূহ এখলাস বহির্ভূত হয়ে যাবে এবং এসব আমলকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি বলা যাবে না। কিন্তু মানুষের কোন কাজ ও এবাদত এ জাতীয় মানসিক আনন্দমুক্ত থাকে না। তাই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সারা জীবনে খাঁটি ভাবে আল্লাহর জন্যে একটি মুহূর্তও পাবে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেননা, এখলাস অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। মনকে উপরোক্ত রূপ মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। নিরেট নৈকট্য লাভের নিয়ত সেই ব্যক্তির জন্যে কল্পনা করা যায়, যে আল্লাহর পাগলপারা আশেক, আখরাতের চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং এ ধরনের পার্থিব মহব্বতের জন্যে যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অবকাশ নেই। এমনকি, খানাপিনার প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। এগুলোর প্রয়োজন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনের বেশী নয়। এরূপ ব্যক্তি আহার, পান, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি সকল কাজের ক্ষেত্রে খাঁটি আমলকারী ও সঠিক নিয়ত বিশিষ্ট হবে। এমনকি, সে এই নিয়তে ঘুমাবে যাতে পরবর্তী এবাদতের জন্যে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় তার নিদ্রাও এবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আমলে এখলাসের উপস্থিতি খুবই বিরল হবে। এ থেকে এখলাস অর্জনের এই উপায় জানা যায় যে, জৈবিক বাসনা ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে, দুনিয়ার লোভ-লালসা ছিন্ন করতে হবে এবং অন্তরে আখেরাতের চিন্তাই প্রবল রাখতে হবে।

এমন অনেক আমল রয়েছে, যেগুলোতে মানুষ শ্রম স্বীকার করে এবং একান্ত ভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ধারণা পোষণ করে অথচ এটা মানুষের একটা বিভ্রান্তি। কেননা, এতে বিপদের কারণ তাদের জানা থাকে না। উদাহরণতঃ জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি ত্রিশ বছরের নামায কাযা পড়েছি। এগুলো আমি মসজিদের প্রথম সারিতে পড়েছিলাম। কাযার কারণ, একদিন ওযরবশত আমার মসজিদে যেতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে, আমি দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়লাম এবং মনে মনে খুব লজ্জিত হলাম যে, মুসল্লীরা আমাকে দ্বিতীয় সারিতে দেখেছে। এই লজ্জা থেকে জানতে পারলাম, লোকেরা আমাকে যে প্রথম সারিতে দেখত, তাতে আমি আন্তরিকভাবে খুশী ও আনন্দিত হতাম। অথচ পূর্বে বিষয়টি টের পাইনি।

বলা বাহুল্য, এটা এমন একটি সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয়, যা থেকে আমল কমই মুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকেই এটা টেরও পায় না। আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন, তাদের কথা ভিন্ন। যারা এ থেকে গাফেল, তারা আখেরাতে নিজের সৎ আমলসমূহকে গোনাহ আকারে দেখতে পাবে। নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতে এরূপ লোকদের কথাই বুঝানো হয়েছে—

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا -

অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে এমন বিষয় প্রকাশ পাবে, যার ধারণা তারা করত না এবং নিজের উপার্জিত কর্মের গোনাহ তাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا -

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে তাদের কথা কি বলব, যারা আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত! তারা এমন লোক, যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই সীমিত; অথচ তারা মনে করে তারা চমৎকার কাজ করছে।

আলেম সমাজই এই ফেতনায় সর্বাধিক পতিত। তাদের অধিকাংশের ইলম চর্চায় যে প্রেরণাটি কাজ করে, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের আনন্দ এবং তারীফ ও প্রশংসা-প্রীতি। শয়তান তাদের সামনে সত্যকে গোপন করে দেয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, তোমার উদ্দেশ্য তো খোদায়ী ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে বিরোধীদেরকে প্রতিহত করা। ওয়ায়েযরা জনসাধারণকে এবং শাসকবর্গকে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে। সাধারণ মানুষ তাদের উপদেশ মেনে নিলে এবং তাদের প্রতি মনোযোগী হলে তারা আহলাদে আটখানা হয়ে যায়। তারা বলে— আমরা এজন্য আনন্দিত যে, আল্লাহ তা'আলা ধর্মের সাহায্যের কাজে আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন। অথচ তাদের মত অন্য কোন কর্মী সৃষ্টি হয়ে গেলে, সে তাদের চেয়ে ভাল ওয়ায করলে এবং মানুষ

তার প্রতি মনোযোগী হলে তারা তাকে সহ্য করতে পারে না এবং মনে মনে দুঃখিত হয়। এখন প্রশ্ন, যদি দ্বীনের খাতিরেই তারা ওয়ায করত, তবে তাদের অবস্থা এমন হয় কেন? এক্ষেত্রে তো তাদের আরও খুশী হওয়া উচিত ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর করা দরকার ছিল যে, তিনি দ্বীনের একাজে অন্যকে নিযুক্ত করেছেন। ফলে, তাদের একাজে পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। কিন্তু শয়তান এরপরও তাদেরকে ছাড়ে না এবং বলে— তোমাদের দুঃখ এজন্য নয় যে, মানুষ তোমাদেরকে ছেড়ে অন্যের ওয়ায শুনছে; বরং দুঃখ এজন্যে যে, তোমরা সওয়াব লাভে বঞ্চিত হয়েছ। অর্থাৎ, মানুষ তোমাদের ওয়ায দ্বারা সৎপথে আসলে তোমাদের সওয়াব হত। এই সওয়াব না পাওয়ার জন্যে দুঃখ করা খারাপ নয়— ভাল। কিন্তু তারা জানে না যে, সত্যের আনুগত্য এবং উত্তম ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দিলে আখেরাতে সওয়াব বেশী হয় একা নিজে করার তুলনায়। যদি এরূপ দুঃখ করা প্রশংসনীয় হত, তবে হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ)-ও দুঃখ করতেন। কেননা, জনগণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব পালন করা অপরিসীম সওয়াবের কাজ। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতপ্রাপ্তিতে আনন্দিতই হয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জানি না, আজকাল আলেমগণ এ জাতীয় বিষয়সমূহে আনন্দিত হয় না কেন? যারা নফসের চক্রান্ত সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল, তারাই শয়তানের ধোকা সম্পর্কে জানে ও বুঝে।

সারকথা, এখলাসের স্বরূপ জানা ও তদনুযায়ী আমল করা একটি অথৈ সমুদ্র। এতে উত্তীর্ণ হওয়ার মত লোক খুবই বিরল। কোরআনে আছে—

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ –

অর্থাৎ, (শয়তান বলেছিল,) তোমার এখলাস বিশিষ্ট বান্দাগণ ছাড়া আমি সবাইকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ব।

বলা বাহুল্য, এখানে উপরোক্ত বিরল লোকদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব বান্দার উচিত এসব সূক্ষ্ম বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করার কাজে সদা তৎপর থাকা। অন্যথায় সে অজান্তেই শয়তানের দলে ভিড়ে যাবে।

এখলাস সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি ঃ হযরত সূমী (রহঃ) বলেন ঃ এখলাস হল এখলাসের প্রতি লক্ষ্য না থাকা। কেননা, যে এখলাসের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তার এখলাসের জন্যে এখলাসের প্রয়োজন থাকবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমলকে আত্মম্ভরিতা থেকে পরিষ্কার রাখা উচিত। এখলাসের প্রতি দৃষ্টি রাখা আত্মম্ভরিতার নামান্তর, যা আমলের অন্যতম আপদ। খুলুস বা নিষ্ঠা তাকেই বলা হয়, যা যাবতীয় আপদ থেকে মুক্ত হবে। যে এখলাসে আত্মম্ভরিতা থাকে, তাতে একটি আপদ থেকে যায়। হযরত সহল (রহঃ) বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে নিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য পরিব্যাপ্ত। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের উক্তিও এ অর্থই জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিয়ত সাচ্চা করা। হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হল ঃ নফসের জন্যে সর্বাধিক কঠিন কাজ কি? তিনি বললেন ঃ এখলাস। কেননা, এতে নফসের কোন অংশ থাকে না।

রুয়ায়ম (রহঃ) বলেন ঃ আমলের এখলাস হচ্ছে উভয় জাহানে এখলাসের জন্য কোন বিনিময় কামনা না করা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, জৈবিক বাসনা পার্থিব হোক অথবা পারলৌকিক সবই আপদ। আসলে আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিত নয়। এতে সিদ্দীকগণের এখলাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতের আশায় অথবা দোযখের ভয়ে আমল করে, সে পার্থিব ভোগ-বিলাসের দিক দিয়ে মুখলেস বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বাসনার অন্বেষণকারী। সত্যপন্থীদের কাছে সত্যিকার চাওয়ার বিষয় হচ্ছে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।

আবু ওছমান বলেন ঃ এখলাস হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার দিকে সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রেখে সৃষ্টির প্রতি তাকানো বিস্মৃত হওয়া। এতে কেবল রিয়ার আপদ থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ মলিনতা থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার নাম এখলাস। এখলাস সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সন্তোষজনক উক্তি তাই, যা রসূলে আকরাম (সাঃ) করেছেন। তাঁকে এখলাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

ان تقول ربى الله ثم تستقم كما امرت –

অর্থাৎ, একথা বলা যে, আমার পরওয়ারদেগার আল্লাহ। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী সরল পথে অবস্থান করা।

এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের নফস ও খেয়ালখুশীর কিংবা পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কারও এবাদত না করা। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী সোজা ও সরল থাকা। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া। বাস্তব এখলাস তাই।

যে সব বিষয় এখলাসকে কলুষিত করে ঃ যে সব বিষয় এখলাসকে কলুষিত ও দূষিত করে, সেগুলোর মধ্যে কতক সুস্পষ্ট ও কতক অস্পষ্ট। সুস্পষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রিয়া। উদাহরণতঃ যখন কেউ নামাযে এখলাস করে, তখন যদি কিছু লোক তাকে দেখে অথবা কাছে আসে, তখন শয়তান তাকে বলে নামায উত্তমরূপে পড় যাতে দর্শকরা তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং সাধু মনে করে। নামাযী একথা মেনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিনয় প্রকাশ করে এবং রুকু-সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে। প্রথম স্তরের এই রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের নামাযীদের কাছেও গোপন থাকে না। রিয়ার দ্বিতীয় স্তর এই যে, নামাযী এই আপদটি আঁচ করে নেয় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করে। অর্থাৎ, শয়তানের আনুগত্য করে না এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; বরং পূর্বে যেভাবে পড়ত, সেভাবেই পড়তে থাকে। তখন শয়তান তার কাছে কল্যাণের বাহানায় আসে এবং বলে ঃ তুমি তো অনুসৃত, পুরোহিত ও নামযাদা ব্যক্তি। তুমি যা করবে, তাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে। ফলে, তাদের আমলের সওয়াব তুমিও পাবে যদি তুমি ভালরূপে আমল কর। পক্ষান্তরে তুমি খারাপ আমল করলে অন্যদের খারাপ আমলের কুফল তোমার উপরও বর্তাবে। যারা প্রথম স্তরের ধোকার জালে আবদ্ধ হয় না, তারা কখনও এই দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও রিয়া এবং এর কারণেও এখলাস বরবাদ হয়ে যায়। কেননা, যদি বাস্তবিকই নামাযে খুশু তার কাছে উত্তম হয় যে, অন্যের কারণে তা ত্যাগ করে না, তবে একাকী নামায পড়ার সময় নিজেকে খুশুতে অভ্যস্ত করে না কেন? সত্যিকার সাধু সে ব্যক্তি, যার অন্তর উজ্জ্বল এবং তার ঔজ্জ্বল্য অন্যের উপর প্রতিফলিত হয়। একথা ঠিক যে, কেউ তার অনুসরণ করলে অনুসরণকারী সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু এই অনুসৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যে বিষয় তোমার মধ্যে ছিল না, তা প্রকাশ করলে কেন?

তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম। তা এই যে, বান্দা নিজের নফসের পরীক্ষা নেবে এবং শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হয়ে

জেনে নেবে যে, নির্জনে এক অবস্থা হওয়া এবং জনসমক্ষে অন্য অবস্থা হওয়া নিছক রিয়া। এখানে এখলাস হল, নামায একাকীত্বেও তেমনি হওয়া, যেমন জনসমাবেশে হয়। কেউ যদি মানুষের দেখা অবস্থায় অভ্যাস অনুযায়ী নামাযে অধিক খুশু করে এবং একদিকে দৃষ্টি রেখে একাকীত্বেও নিজ নফসের প্রতি মনোনিবেশ করে অধিক খুশু করে, তবে তাও সূক্ষ্ম ও গোপন রিয়া। কেননা, সে নির্জনে এই নিয়তে উত্তমরূপে নামায পড়ে যে, জনসমাবেশেও যেন উত্তমরূপে নামায আদায় হয়। অতএব, নির্জনে ও জনসমাবেশে উভয় জায়গায় তার লক্ষ্য রইল মানুষের প্রতি। এখানে এখলাস এভাবে হত যে, চতুষ্পদ জন্তুর দেখা ও মানুষের দেখা উভয়টি নামাযীর দৃষ্টিতে সমান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নামাযী ধারণা করে নির্জনে ও জনসমাবেশে একই রূপে নামায পড়লে সে রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তা ঠিক নয়। রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হল মানুষের প্রতি দৃষ্টি তেমনি থাকা, যেমন জড় পদার্থের প্রতি দৃষ্টি হয়— নির্জনে হোক অথবা জনসমাবেশে।

চতুর্থ স্তর যা চূড়ান্ত পর্যায়ের গোপন তা হল এই যে, এক ব্যক্তি শয়তানের ধোকা জেনে ফেলেছে। ফলে, তার নামায পড়া মানুষে দেখলেও শয়তান একথা বলতে পারে না যে, তুমি দর্শকদের খাতিরে খুশু কর। ফলে, শয়তান তার কাছে এসে বলে ঃ আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর, যার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। আল্লাহ তোমার অন্তরকে তাঁর দিক থেকে গাফেল দেখুক— এ বিষয়ে লজ্জাবোধ কর। নামাযীর মনে এ ধারণা আসার সাথে সাথে তার অন্তর হাযির হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুশু করতে শুরু করে। নামাযী মনে করে, এটাই এখলাস। অথচ এটা হুবহু ধোকা ও প্রতারণা। কেননা, যদি আল্লাহর প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে এই খুশু হত, তবে একাকীত্বেও তাই হত। কেবল অন্য কারও আগমনের কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হত না। এই আপদ থেকে বাঁচার আলামত এই যে, উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা একাকীত্বেও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেমন জনসমাবেশে থাকে। মোটকথা, যে পর্যন্ত মানুষের দেখা ও গবাদি পশুর দেখার মধ্যে নিজের আমলে পার্থক্য হতে থাকবে, সে পর্যন্ত নামাযী এখলাস বহির্ভূত এবং গোপন শিরকে লিপ্ত বলে গণ্য হবে। এটাই সেই শিরক, যা মানুষের অন্তরে কালো পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক গোপন, যে পিঁপড়া অন্ধকার রাত্রে কঠিন পাথরের উপর দিয়ে চলে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে।

মিশ্র আমলের সওয়াব ঃ আমল যখন আল্লাহ তা'আলার জন্যে খালেস হয় না এবং তাতে রিয়া ইত্যাদি আপদের মিশ্রণ থাকে, তখন সে আমল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এরূপ মিশ্র আমল দ্বারা সওয়াব পাওয়া যাবে, না শাস্তি, না কোন কিছুই হবে না?— এ সম্পর্কে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, যে আমলের উদ্দেশ্য কেবল রিয়া হবে, তা তো আযাব ও গযবের কারণ হবেই এবং যা বিশেষভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, তা সওয়াবের কারণ হবে। মতভেদ কেবল মিশ্র আমল সম্পর্কে। বাহ্যিক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ রেওয়ায়েতও রয়েছে। আমাদের মতে উদ্দেশ্যের শক্তি ও প্রাবল্যের নিরিখে বিচার হওয়া উচিত। যদি দ্বীনী উদ্দেশ্য ও জৈবিক উদ্দেশ্য সমান সমান হয়, তবে এরূপ আমল সওয়াব ও আযাব এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিরই কারণ হবে না। আর রিয়ার উদ্দেশ্য প্রবল হলে তা আযাবেরই কারণ হবে। তবে এই আযাব শুধু রিয়ার উদ্দেশ্যে করা আমলের আযাব অপেক্ষা হালকা হবে। আর যদি নৈকট্যের নিয়ত প্রবল হয়, তবে যে পরিমাণ প্রবল হবে, সে পরিমাণ সওয়াব হবে। এর কারণ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

অর্থাৎ, যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

আরও এরশাদ হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। পুণ্য কাজ হলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন।

এসব আয়াত থেকে বুঝা যায়, সৎকর্মের ইচ্ছা পণ্ড হবে না। যদি সৎ কর্মের ইচ্ছা রিয়ার ইচ্ছা অপেক্ষা প্রবল হয়, তবে রিয়ার ইচ্ছার সমান তা পণ্ড হবে এবং বাড়তিটুকু অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি সৎ কর্মের ইচ্ছা কম এবং রিয়ার ইচ্ছা বেশী হয়, তবে শুধু রিয়ার ইচ্ছার কারণে যতটুকু আযাব হত, তা থেকে সৎকর্মের ইচ্ছা পরিমাণ আযাব কমে যাবে। সুতরাং যদি কেউ এমন সৎকর্ম করে, যা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক ফুট নৈকট্য অর্জিত

হয় এবং তাঁর সাথে এমন অসৎকর্ম করে, যা দ্বারা উদাহরণ স্বরূপ এক ফুট দূরত্ব অর্জিত হয়, তবে এই ব্যক্তি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তাতেই থেকে যাবে। না সওয়াব হবে, না আযাব। হাদীস শরীফে আছে—

اتبع السيئة الحسنة تمحا -

অর্থাৎ, অসৎ কর্মের পেছনে সৎকর্ম কর। এই সৎকর্ম অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেবে।

সুতরাং নির্ভেজাল রিয়াকে নির্ভেজাল এখলাস মিটিয়ে দেয়। যদি কারও মধ্যে উভয়টি একত্রিত হয়, তবে একটি অপরটির বিপরীত ক্রিয়া করবে। এ বিষয়ে উম্মতের এজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জে রওয়ানা হয় এবং তার সাথে পণ্য সামগ্রীও থাকে, তার হজ্জ জায়েয হবে এবং সে হজ্জের সওয়াব পাবে।

অবশ্য আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় রিয়ার সংমিশ্রণ সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়। হজ্জের সফরে ব্যবসায়ের ইচ্ছা করাও অনুরূপ একটি সংমিশ্রণ। তাউস এবং আরও কয়েকজন তাবেঈ রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করে এবং তাতে পছন্দ করে যে, মানুষ তার প্রশংসা করুক এবং সওয়াবও হোক। রসূলে করীম (সাঃ) এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং নিজের পালনকর্তার এবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

হযরত মুয়ায (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিয়াকে নিম্নতম শিরক বলেছেন। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার আমলে শিরক করবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার প্রতিদান তার কাছ থেকে গ্রহণ কর, যার জন্যে তুমি আমল

করেছিলে। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি আত্মমর্যাদার জন্যে যুদ্ধ করে, অন্যজন বীরত্বের খাতিরে যুদ্ধে নামে এবং তৃতীয় জন আল্লাহর কাছে নিজের মর্যাদা জানার জন্যে লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

আমরা বলি, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কেননা, এগুলোতে সে ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যে দুনিয়ার জন্যেই আমল করে এবং দুনিয়ার অন্বেষণই তার নিয়তে প্রবল থাকে। দ্বীনী আমলের বিনিময়ে দুনিয়া তলব করা হারাম। কেননা, এতে এবাদত স্বস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মিশ্র আমল বলতে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আমল, যাতে উভয় নিয়ত সমান সমান থাকে। এরূপ আমলে সওয়াব ও আযাব কিছুই হয় না। সুতরাং এরূপ আমল দ্বারা সওয়াবের আশা করা উচিত নয়।

মোটকথা, এখলাসে আপদ অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপদের কারণে আমল ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের উপরোক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য আসলে এখলাসকে ত্যাগ না করা। যদি আমলই না করা হয়, তবে আমল ও এখলাস উভয়টি বর্জিত হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, জনৈক ফকীর হযরত আবু সাঈদ হেরাযের খেদমত করত এবং তাকে কাজকর্মে সাহায্য করত। একদিন তিনি ফকীরকে কাজকর্মে এখলাস অবলম্বন করতে বললেন। ফকীর প্রত্যেক কাজের সময় অন্তরের অবস্থা দেখতে লাগল। এখলাস অর্জনে অক্ষম হয়ে অবশেষে সে কাজকর্মই বন্ধ করে দিল। এতে হযরত আবু সাঈদ কষ্টে পড়ে গেলেন। কারণ, তার কাজকর্মে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। তিনি ফকীরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এখন কাজ কর না কেন? ফকীর বলল ঃ আপনার এরশাদ অনুযায়ী এখলাস অবলম্বনে ব্যর্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। এখলাস আমলকে ছিন্ন করে না। আমল করে যাও এবং এখলাস অর্জনের চেষ্টা করতে থাক। আমি তোমাকে আমল ছেড়ে দিতে বলিনি। বরং আমলকে খাঁটি করতে বলেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিদ্কের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, "তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে।"

সিদ্কের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'সিদ্দীক' শব্দটি এ থেকেই উদগত! আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রশংসায় তাদেরকে সিদ্দীক বলেছেন। বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ, কিতাবে ইবরাহীমের আলোচনা করুন। সে ছিল সিদ্দীক তথা সাচ্চা নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا -

অর্থাৎ, কিতাবে ইদ্রীসের আলোচনা করুন। সে ছিল সিদ্দীক ও নবী। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا - وان الكذب يهدى الى الفجور والفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا -

অর্থাৎ, সত্যবাদিতা পূণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য বলতে থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক হিসাবে লিখিত হয়। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়। পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর উপকার সে-ই পায়, যার মাঝে এগুলো থাকে— সত্যবাদিতা, লজ্জা, সচ্চরিত্রতা ও শোকর। বিশর ইবনে হারেছ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে নিষ্ঠা সহকারে আচরণ করে, সে মানুষকে ঘৃণা করে। এক ব্যক্তি জনৈক দার্শনিককে বলল ঃ আমি কোন সাচ্চা মানুষ দেখিনি। দার্শনিক বলল ঃ যদি তুমি সাচ্চা হতে, তবে সাচ্চাদেরকে চিনতে। জনৈক ব্যক্তি হযরত শিবলী (রহঃ)-এর মজলিসে চিৎকার দিয়ে উঠল। অতঃপর সে দজলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত শিবলী বললেন ঃ যদি সে সাচ্চা হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে দেবেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-কে বাঁচিয়েছিলেন। আর যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তাকে নিমজ্জিত করে দেবেন, যেমন ফেরাউনকে নিমজ্জিত করেছিলেন।

আলেম ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনটি বিষয় সঠিক হয়ে গেলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যাবে— (১) বেদআত ও খেয়ালখুশীমুক্ত ইসলাম, (২) আমলসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিষ্ঠা এবং (৩) হালাল খাদ্য। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন ঃ আমি তাওরাতের প্রান্তটীকায় বাইশটি বাক্য দেখেছি যা বনী ইসরাঈলের সাধু বক্তিরা সমবেত হয়ে পাঠ করত। বাক্যগুলো এই ঃ কোন ভাণ্ডার জ্ঞানের চেয়ে অধিক উপকারী নয়। কোন ধন সহনশীলতা অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক নয়। কোন স্বভাব ক্রোধের চেয়ে অধিক নীচ নয়। কোন সঙ্গী আমলের চেয়ে বেশী শোভাদায়ক নয়। কোন সহচর মূর্খতার চেয়ে অধিক দোষী নয়। কোন গৌরব খোদাভীতি অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। কোন বীরত্ব বাসনা বর্জনের চেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ নয়। কোন আমল চিন্তা-ভাবনা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নয়। কোন পুণ্য কাজ সবর অপেক্ষা উচ্চ নয়। কোন দোষ অহংকার অপেক্ষা অধিক অপমানকর নয়। কোন ঔষধ নম্রতার চেয়ে অধিক নরম নয়। কোন ব্যাধি বোকামি অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক নয়। কোন রসূল সত্য বিমুখ নয়। সত্যবাদিতার চেয়ে অধিক কোন হিতাকাংখী নেই। কোন ফকীর-লোভের চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত নয়। কোন প্রাচুর্য সম্পদ আগলে রাখার চেয়ে অধিক হতভাগা নয়। কোন জীবন সুস্থতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর নয়। সাধুতার চেয়ে অধিক সহনীয় কোন পাপ নেই। খুশুর চেয়ে উত্তম কোন এবাদত নেই। অল্পে তুষ্টির চেয়ে ভাল কোন বৈরাগ্য নেই। চুপ থাকার চেয়ে অধিক কোন হেফাযতকারী নেই। কোন অদৃশ্য বস্তু মৃত্যুর চেয়ে অধিক নিকটবর্তী নয়।

মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ মরুযী বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে নিষ্ঠার সাথে অন্বেষণ করবে, তখন তিনি তোমার হাতে একটি আয়না

দিবেন, যার মধ্যে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখতে পাবে।

সিদ্‌কের স্বরূপ ঃ "সিদ্‌ক" তথা নিষ্ঠা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) কথায় নিষ্ঠা, (২) নিয়তে নিষ্ঠা (৩) সংকল্পে নিষ্ঠা (৪) সংকল্প বাস্তবায়নে নিষ্ঠা (৫) আমলে নিষ্ঠা এবং (৬) ধর্মীয় মকামসমূহে নিষ্ঠা। যে ব্যক্তি এই ছয়টি বিষয়েই নিষ্ঠার গুণে গুণান্বিত হয়, তাকে বলা হয় সিদ্দীক। কারণ, সে সিদকের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। এখন এই ছয়টি অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) কথায় সত্যবাদিতা বা নিষ্ঠা সেই সমস্ত উক্তি ও খবরে হয়ে থাকে, যেগুলো অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওয়াদা পূর্ণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য নিজের কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সত্য ছাড়া কোনরূপ কথাবার্তা না বলা। সিদকের সকল প্রকারের মধ্যে এ প্রকারটিই সর্বাধিক স্পষ্ট। যে ব্যক্তি নিজের মুখের হেফাযত করে এবং বাস্তব অবস্থার খেলাফ কিছু না বলে, তাকে বলা হয় সাদেক তথা সত্যবাদী। কিন্তু এই সিদকের পূর্ণতার দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম, রূপক ভাষা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, বলা হয়, মিথ্যা এড়ানোর জন্যে রূপক ভাষার আশ্রয় নেয়া হয়। আসলে এটাও মিথ্যার স্থলবর্তী। মাঝে মাঝে সময়ের উপযোগিতার কারণে এর আশ্রয় নিতে হয়। যেমন, বালক-বালিকা ও নারীদের শাসন করার ক্ষেত্রে, যালেমদের কবল থেকে আত্মরক্ষার বেলায় এবং শত্রুর মোকাবিলা করার সময়। এসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব রূপক ভাষা ব্যবহার করা যায়, যাতে পরিষ্কার মিথ্যা না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতি ছিল তিনি যখন সফরে রওয়ানা হতেন, তখন অন্যদের কাছে তা গোপন রাখতেন, যাতে শত্রুরা খবর না পায়। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا اونمى خيرا -

অর্থাৎ, সে মিথ্যাবাদী নয়, যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে ভাল কথা বলে অথবা ভাল কথা পৌঁছায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন জায়গায় মিথ্যা ভাষণকে সময়োপযোগী বলেছেন। এক— যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। দুই— যার দুই স্ত্রী রয়েছে এবং তিন— যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব জায়গায় সিদকের অর্থ নিয়তের সত্যবাদিতা। ফলে সৎ নিয়ত ও সদিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখা

হয়, ভাষার প্রতি নয়। সুতরাং যার ইচ্ছা সৎ হবে এবং শুধু কল্যাণই কাম্য হবে, সে সত্যবাদী ও সিদ্দীক কথিত হবে। এতদসত্ত্বেও এসব জায়গায় ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণনা করা উত্তম। উদাহরণতঃ বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গকে যখন কোন যালেম ব্যক্তি তালাশ করত এবং তিনি ঘরেই থাকতেন, তখন নিজের স্ত্রীকে বলতেন— অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে একটি বৃত্ত আঁক এবং তার ভিতরে আঙ্গুল রেখে বলে দাও তিনি এখানে নেই। এ বাহানায় তিনি মিথ্যা বলা থেকে এবং যালেম থেকে আত্মরক্ষা করতেন। পত্নীর কথা সত্য হত; কিন্তু যালেম বুঝত যে, তিনি ঘরে নেই।

পূর্ণতার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ব্যবহৃত ভাষার অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা। নতুবা মুখে সত্য কথা বললে এবং নিজের অবস্থা সে অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে মিথ্যা ভাষণ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ কেউ আল্লাহর কাছে মোনাজাত ও দোয়ায় মুখে বলে—

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

অর্থাৎ, আমি আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার প্রতি নিবিষ্ট করলাম, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু তার অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ এবং দুনিয়ার কামনা-বাসনায় মশগুল। এমতাবস্থায় সে হবে মিথ্যাবাদী। অথবা কেউ মুখে বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ, আমি শুধুমাত্র তোমারই বন্দেগী করি, অথচ তার মধ্যে বন্দেগীর স্বরূপ অনুপস্থিত থাকে, তবে তার কথা সত্য হবে না।

(২) নিয়তে সত্যবাদিতা হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, সাধকের যাবতীয় কাজকর্মের প্রেরণাদাতা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছু না হওয়া। অতএব, যদি কোন জৈবিক বাসনা এর সাথে মিলিত হয়ে যায়, তবে নিয়তের সত্যতা বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সাধককে মিথ্যাবাদী বলা হবে। এখলাসের ফযীলত সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক হাদীসে তিন ব্যক্তির প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আলেমকে প্রশ্ন করা হবে তুমি ইলম শিখে কি আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আমি অমুক কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী; বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলুক। এখানে লক্ষণীয় যে, তাকে একথা বলা হয়নি যে, তুমি আমল করনি; বরং কেবল নিয়তের ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এমনিভাবে

মুনাফিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে—

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অথচ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছিল اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। তাদের এ কথাটি সত্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কথাটিকে মিথ্যা বলেননি; বরং একথা বলার পেছনে তাদের অন্তরে যে নিয়ত লুক্কায়িত ছিল, তাকে মিথ্যা বলেছেন।

(৩) সংকল্পে সত্যবাদিতার অর্থ এই যে, মানুষ কখনও আমল করার পূর্বে মনে মনে সংকল্প করে বলে, যদি আলাহ তা'আলা আমাকে অর্থ-সম্পদ দান করেন, তবে সমস্তই সদকা করে দেব অথবা অর্ধেক সদকা করব। এই সংকল্প কখনও মানুষের মনে পাকাপোক্ত ও সত্যিকারভাবে হয় এবং কখনও এতে এক প্রকার সংশয় ও দুর্বলতা থাকে। এই সংশয় ও দুর্বলতা সিদ্কের পরিপন্থী। অতএব, এখানে সিদ্কের অর্থ যেন শক্তিশালী হওয়া। এই অর্থ অনুযায়ী সাদেক ও সিদ্দীক এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যে তার সদকা করার সংকল্পকে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী পায়।

(৪) সংকল্প বাস্তবায়নেও সিদ্কের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, মানুষ প্রায়ই সংকল্প করে ফেলে। কারণ, এতে কোন কিছু ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু যখন বাস্তবায়নের সময় আসে, তখন কামনা-বাসনা জোরদার হবার কারণে সংকল্প শিথিল হয়ে যায়। এটা সংকল্প বাস্তবায়নে সিদকের পরিপন্থী। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের সিদ্ক সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ, তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে।

এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদর যুদ্ধে ওযরবশত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শরীক ছিলেন না। এটা ছিল তার জন্যে অসহনীয়। তিনি বললেন ঃ এটা ছিল শাহাদত লাভের প্রথম সুযোগ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যোগদান করেছেন, আর আমি কি না অনুপস্থিত রইলাম! আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে শাহাদত লাভের এরূপ সুযোগ আবার এলে আল্লাহ তা'আলা দেখবেন

আমি কি করি! বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই আনাস ইবনে নযর পরবর্তী বছর উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সা'দ ইবনে মুয়ায তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আমর, কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের চমৎকার হাওয়া আমি উহুদের দিক থেকে অনুভব করছি। এরপর তিনি বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। তাঁর দেহে আশিটির উপরে তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাত ছিল। তাঁর ভগ্নী বলেন ঃ যখমের কারণে আমি আমার ভাইকে চিনতে পারিনি। এরপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেখে চিনতে পেরেছি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ চার ব্যক্তি শহীদ— (১) যে ঈমানদার শত্রুকে দেখে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন মানুষ এই ব্যক্তির প্রতি মাথা তুলে তাকাবে। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা তুললেন যাতে তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। (২) যে ঈমানদার শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর একটি ঘাতক তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং সে শহীদ হয়ে যায়। (৩) যে ঈমানদার কিছু ভাল ও কিছু মন্দ আমল করে। অতঃপর শত্রুর সাথে ভিড়ে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। (৪) যে ঈমানদার নিজের উপর যুলুম করে। অতঃপর শত্রুর মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, দুটি লোক মানুষের সামনে এসে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ধন-সম্পদ দিলে আমরা সদকা করব। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধন-সম্পদ দিলেন। কিন্তু তারা কৃপণতা অবলম্বন করল। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّآ اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ -

অর্থাৎ, তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করল, যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ (ধন-সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা সদকা করব এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ যখন

তাদেরকে অনুগ্রহ করে দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা অবলম্বন করল এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। অতঃপর আল্লাহ এর চিহ্ন হিসাবে নিফাক স্থাপন করে দিলেন, তাদের অন্তর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার খেলাফ করেছিল।

এ আয়াতে সংকল্পকে অঙ্গীকার বলা হয়েছে এবং এর খেলাফ করাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সিদ্ক তৃতীয় প্রকার সিদ্কের তুলনায় কঠিনতর। কেননা, মানুষ কখনও সংকল্প করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবায়নের সময় এলে নানাবিধ বাসনার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হয়ে পিছু হটে যায়।

(৫) আমলে সত্যবাদিতা হচ্ছে এমন চেষ্টা করা যাতে বাহ্যিক আমলে কোনরূপ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ, যে গুণ বাস্তবে তার মধ্যে নেই, বাহ্যিক আমল দ্বারা তা যেন আছে বলে প্রকাশ না পায়। কিন্তু এ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পাওয়া যেন আমল বর্জন করার মাধ্যমে না হয়। এই সিদ্কের উদ্দেশ্য রিয়া বর্জন নয়। কেননা, অধিকাংশ নামাযী নামাযে খুশুখুযুর আকার ধারণ করে থাকে। কিন্তু রিয়া তথা কাউকে দেখানো তাদের উদ্দেশ্য থাকে না; কিন্তু তাদের অন্তর নামায থেকে গাফেল থাকে এবং বাজারে ঘুরাফেরা করে। এরূপ ব্যক্তি আমলে মিথ্যাবাদী এবং সে সিদক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে— রিয়া সম্পর্কে নয়। মোটকথা, বাহ্যিক অবস্থা অন্তরের অবস্থার পরিপন্থী হওয়া ইচ্ছাকৃত হলে তা রিয়া। এর ফলে এখলাস বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যদি অনিচ্ছায় হয়, তবে সেটা মিথ্যা এবং এতে সিদক বিনষ্ট হয়। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) এরূপ দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِىْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِىْ صَالِحَةً -

অর্থাৎ, ইলাহী, আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা উত্তম করে দাও এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাকে সৎ করে দাও।

যায়দ ইবনে হারেছ বলেন ঃ যখন মানুষের বাইরের অবস্থা ও ভেতরের অবস্থা সমান হয়ে যায়, তখন সে পুণ্যবান হয়ে যায়। যদি ভেতরের অবস্থা বাইরের তুলনায় ভাল হয়, তবে তাকে বলা হয় "ফয্ল"। আর বাইরের অবস্থা ভেতরের তুলনায় উত্তম হলে তার নাম হয় "জুর" তথা অন্যায়।